মুসলিম মননে চিন্তার ঐক্য ১

ড. ইউসুফ আল কারযাভী

ইসলামের ব্যাপকতা

অনুবাদ : তারিক মাহমুদ

نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام : ١

মুসলিম মননে চিন্তার ঐক্য সিরিজ-০১

ইসলামের ব্যাপকতা

شمول الإسلام

ড. ইউসুফ আল কারযাভী

অনুবাদ

তারিক মাহমুদ

প্রচ্ছদ প্রকাশন

www.bjilibrary.com

মুসলিম মননে চিন্তার ঐক্য সিরিজ-০১

ইসলামের ব্যাপকতা

মূল : ড. ইউসুফ আল কারযাভী

অনুবাদ : তারিক মাহমুদ

প্রচ্ছদ প্রকাশন

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা)

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৩১৫-৩৭৩০২৫

prossodinfo@gmail.com

www.prossodprokashon.com

১ম সংস্করণ

১ম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৯; ২য় মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০২০

৩য় মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০২১

২য় সংস্করণ

৪র্থ মুদ্রণ : আগস্ট, ২০২২; ৫ম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

অনুবাদস্বত্ব : অনুবাদক

সম্পাদনা : ওয়াহিদ জামান, আবু সুফিয়ান

প্রচ্ছদ : হাশেম আলী

একমাত্র পরিবেশক : একাত্তর প্রকাশনী

প্রকাশনাক্রম : ০৩

মূল্য : ২৪০/- (দুইশত চল্লিশ টাকা)

ISLAMER BAPOKOTA

by Dr. Yusuf Al-Qaradawi

Translated by Tareq Mahmud

Published by Prossod Prokashon

ISBN : 978-984-94357-2-3

www.bjilibrary.com

প্রকাশকের কথা

ইমাম হাসান আল বান্না বিংশ শতাব্দীর ইসলামি পুনর্জাগরণের প্রাণপুরুষ। তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি দাঈ; এমনকি তিনি 'ইমামুদ দাওয়াহ' অভিধায় সমধিক পরিচিত।

মুসলিম বিশ্বে বিগত দু-শতকের মনীষীদের মধ্যে ইমাম হাসান আল বান্না সর্বাধিক পরিচিত নাম। বাংলাদেশের ইসলাম-সচেতন মানুষদের কাছেও তিনি পরিচিত ও অতি আপনজন। তাঁর কর্ম ও চিন্তাধারার সাথে বাংলাভাষী পাঠকদের পরিচয় নতুন নয়। ইমাম হাসান আল বান্না দাওয়াহর সম্প্রসারণে তাঁর মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করেছেন বেশি; লিখেছেন তুলনামূলক কম। ইমাম বান্নার রচনাবলির কিয়দংশ অনুবাদ করে একটি সংকলন প্রকাশ করেন বাংলা ভাষায় ইসলামি জ্ঞানচর্চার কিংবদন্তি মনীষী মরহুম মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, যা মদীনা পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আশির দশকে সিন্দাবাদ প্রকাশনী নামের আরও একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান *মুয়াজ্জিনের আজান* শিরোনামে ইমাম বান্নার রচনাবলি প্রকাশ করেছিল। *হাসানুল বান্নার ডায়েরি* প্রকাশিত হয়েছে প্রফেসর'স পাবলিকেশন থেকে। আধুনিক প্রকাশনী ইমাম বান্নার রচিত কয়েকটি পুস্তিকার অনুবাদ প্রকাশ করেছে। এসব প্রকাশনার কারণে ইমাম হাসান আল বান্নার দাওয়াতি কার্যক্রম, তারবিয়াত পদ্ধতি, সংগঠন পরিচালনার মূলনীতি বিষয়ে এ দেশের ইসলামি সাহিত্যের পাঠকরা অনেকটা পরিচিত।

ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের জ্ঞানের বিশুদ্ধতা, তারবিয়াত ও চিন্তার ঐক্যের নীতিমালাস্বরূপ ইমাম হাসান আল বান্না বিশটি মূলনীতি লিখেছিলেন। বর্ষীয়ান আলিম শাইখ আবদুল মুনয়িম আহমাদ তুয়াইলিব, উসতায মুহাম্মাদ আল গাযালি, উসতায আবদুল কারিম যাইদান সহ অনেকেই এ বিশ মূলনীতির ব্যাখ্যায় কলম ধরেছেন। আর উসতায ইউসুফ আল কারযাভী ইমামের বিশ মূলনীতির ব্যাখ্যায় 'ইসলামের কর্মীদের চিন্তার ঐক্য' শিরোনামে দশটি বইয়ের এক অনবদ্য সিরিজ রচনা করেছেন, যা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

প্রচ্ছদ প্রকাশন উসতায ইউসুফ কারযাভী রচিত পুরো সিরিজটি পর্যায়ক্রমে বাংলাভাষাভাষী পাঠকদের জন্য অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছে। সিরিজের প্রথম বই *শুমুলুল ইসলাম*-এর অনুবাদ *ইসলামের ব্যাপকতা* প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১৯-এর আগস্টে। প্রকাশের পরপরই পাঠকমহলে সমাদৃত হয় বইটি। তিনটি মুদ্রণ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। পূর্ববর্তী মুদ্রণসমূহের ত্রুটি যথাসম্ভব পরিমার্জন করা হয়েছে দ্বিতীয় সংস্করণে। এবার বইটির ৫ম মুদ্রণ প্রকাশিত হচ্ছে। বইটি মুসলিম মননে চিন্তার ঐক্য বিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, ইনশাআল্লাহ।

ইমাম হাসান আল বান্নাকে নিয়ে ব্যাপকভিত্তিক কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে প্রচ্ছদ প্রকাশন। ইতোমধ্যে প্রচ্ছদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে–ড. ইউসুফ আল কারযাভী রচিত *ইমাম হাসান আল বান্না : নতুন যুগের নির্মাতা*, *ইসলামের ব্যাপকতা*, *ইমাম বান্নার পাঠশালা*, *ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইতিহাস*; ড. আবদুল কারিম যাইদান রচিত *ইসলাম বোঝার রূপরেখা : ইমাম বান্নার বিশ মূলনীতি*; ইমামের নিজের রচিত *ইমাম হাসান আল বান্নার ওযিফা*, *ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি নসিহত* প্রভৃতি বই। প্রকাশের প্রক্রিয়াধীন তালিকায় আছে আরও বেশ কিছু গ্রন্থ। আল্লাহই একমাত্র তাওফিকদাতা।

প্রকাশক

www.bjilibrary.com

অনুবাদকের কথা

২০১৫ সালের শুরুতে একটি স্টাডি সার্কেলে অংশগ্রহণ করেছিলাম। উদ্যোক্তা ছিলেন জামাল উদ্দিন ভাই। নিয়মিত স্টাডি সার্কেলের জন্য আমরা একটি প্রয়োজনীয় ও উপযোগী টপিক খুঁজছিলাম। তখন আলোচনায় আসে ড. ইউসুফ আল কারযাভীর نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام সিরিজটি। বাংলা করলে এ সিরিজের নাম দাঁড়ায়– ইসলামের কর্মীদের চিন্তার ঐক্য।

সিরিজটি ইমাম হাসান আল বান্নার উসুলুল ইশরিনের ব্যাখ্যা। ইমাম বান্না ইসলামের জন্য কাজ করতে ইচ্ছুক বিভিন্ন মাযহাব, মানহাজ ও তরিকার লোকদের একই ছাতার নিচে নিয়ে আসতে তিন পৃষ্ঠার একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলেন। এই নীতিগুলো প্রণয়নের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল, কখনও ইসলামি সংগঠনগুলো একত্রে কাজ করতে চাইলে তার একটি প্রস্তুত খসড়া সরবরাহ করা। ড. কারযাভী আশির দশক থেকে এই নীতিসমূহের লিখিত ব্যাখ্যা শুরু করেন।

জামাল ভাইয়ের পরামর্শ ছিল, আকিদার অংশ দিয়ে শুরু করা। আকিদাসংক্রান্ত নীতির ব্যাখ্যাগ্রন্থ فصول في العقيدة بين السلف والخلف (সালাফ-খালাফের আকিদার পাঠ) আমরা একসাথে পড়া শেষ করি। বইটির পাঠ শেষে আমার মনে হয়েছিল, একজন সচেতন মুসলিম এই বইটি পড়ার পর আকিদার প্রশ্নে কেউ-ই তাকে বিভ্রান্ত বা বীতশ্রদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। কারণ, আকিদার মতপার্থক্যপূর্ণ মতগুলো নিয়ে তার পষ্ট একটি ধারণা অর্জিত হবে এবং সে আকিদাবিষয়ক প্রশ্নের সমাধান পেয়ে যাবে। স্টাডি সার্কেলে আমরা মোট ছয়জন ছিলাম। আমরা সবাই এই সিরিজের বইগুলো কিনি। তবে পরে আর একসাথে বসা হয়নি। আমরা ব্যক্তিগতভাবে বইগুলো অধ্যয়ন করতে থাকি।

আমি আরও বেশক'টি সংশয়ের সমাধান এ সিরিজে পেয়ে যাই– যা ইতঃপূর্বে অনেক খোঁজাখুঁজির পরও প্রত্যাশিত মানে পাইনি। তাই গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করলাম, এ সিরিজটি বাংলাভাষী মুসলিমদের কাছে পেশ করা উচিত।

www.bjilibrary.com

কেননা, তারা আকিদার প্রশ্নে খুবই করুণ অবস্থানে আছে; আর খিলাফতের স্লোগানে মাঝে মাঝেই বিভ্রান্তিতে পড়ে এবং ইখতিলাফ ও বিদআতের প্রশ্নে তারা বিব্রত ও হতাশ।

উত্থাপিত নানা প্রশ্ন ও সংশয়ের সমাধান তারা পেতে পারে শাইখ কারযাভী লিখিত *ইসলামের কর্মীদের চিন্তার ঐক্য* সিরিজে। এ সিরিজের কলেবর মোটামুটি ২৫০০ পৃষ্ঠা। আমি এ সিরিজটির বাংলা অনুবাদে মনস্থির করি। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে দেশে আসার পর এ সিরিজের প্রথম খণ্ড অনুবাদে হাত দিই। পঁচানব্বই ভাগ অনুবাদ করার পর নানা ব্যস্ততায় আর শেষ করা হয়ে ওঠেনি। প্রচ্ছদ প্রকাশন-এর আবু সুফিয়ান ও সাইফুল্লাহ ভাই অনুবাদের পাণ্ডুলিপি পড়ে খুবই উৎসাহ দেখান। মাত্র আঠারো ঘণ্টার ব্যবধানে তারা আমাকে জানান, প্রচ্ছদ প্রকাশন থেকে তারা বইটি প্রকাশ করতে আগ্রহী। তারা পুরো সিরিজটি প্রকাশের ব্যাপারেও উৎসাহ দেখান। তাদের আগ্রহে আমি বাকি অংশের অনুবাদ শেষ করি।

আলহামদুলিল্লাহ! অবশেষে বইটি প্রকাশিত হলো। বইটি পড়ে পাঠক ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ ও সামগ্রিকতাকে উপলব্ধি করতে পারবেন বলেই আমাদের প্রত্যাশা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

তারিক মাহমুদ
আগস্ট, ২০১৯

www.bjilibrary.com

সূচিপত্র

ভূমিকা ১১

বিস্তৃত পাঠের সারসংক্ষেপ ১৬

আল উসুলুল ইশরুন (বিশ মূলনীতি) ২১

বিশ মূলনীতি : প্রাসঙ্গিক বুনিয়াদি আলাপ ৩১

'রুকনুল ফাহম'-কে সর্বাগ্রে আনার কারণ ৩১

'ইলম'-এর পরিবর্তে 'ফাহম' শব্দ ব্যবহারের কারণ ৩৭

সঠিক উপলব্ধি শ্রেষ্ঠ নিয়ামত ৩৮

উসুলগুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ ৩৯

উসুলগুলো কাদের উদ্দেশে লিখিত ৪১

বিশ মূলনীতির কিছু বৈশিষ্ট্য ৪৩

ঐক্য ও সমঝোতার নির্দশন ৪৪

প্রথম মূলনীতি :

ইসলাম সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা ৫০

ইখওয়ান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে মিশরের দ্বীনি সংগঠনগুলোর অবস্থা ৫১

রাজনৈতিক দলসমূহের অবস্থা ৫৪

www.bjilibrary.com

ইসলামি দাওয়াহর কৃত্রিম বিভাজনের মোকাবিলা ৫৫
ইসলামের ব্যাপকতায় জোর দেওয়ার কারণ ৫৭
এক. ইসলামি জ্ঞানের ব্যাপকতা ৫৭
দুই. খণ্ডিত দ্বীন-চর্চা ইসলাম-সমর্থিত নয় ৫৯
তিন : জীবন অভিভাজ্য ৬১
পূর্ণাঙ্গ ইসলামের মৌলিক দিকসমূহ ৬৪

রাষ্ট্র, রাজনীতি ও ইসলাম ৬৭
ইসলামে রাষ্ট্রের অবস্থান ৬৭
ইসলামি জ্ঞানের উৎস থেকে দলিল ৬৯
ইসলামের ইতিহাস থেকে দলিল ৭২
ইসলামের ভাবধারা থেকে দলিল ৭৬
ইসলামের ধারক একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ৮১
আমাদের যদি একটা সরকার থাকত ৮২

ইসলাম ও রাজনীতি ৮৫

ভূখণ্ড ও জাতীয়তাবাদ ৯৩
আমাদের জাতীয়তাবাদের পরিসীমা ৯৮
আমাদের জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত সীমা ৯৯
ঐক্য ও ধর্মীয় বিভিন্নতা ৯৯
ইমাম বান্নার চিন্তায় মিশরি জাতীয়তাবাদ ১০১
জাতীয়তা ও স্বাধীনতার ইস্যুতে ইখওয়ানের সম্মেলন ১০২
ইসলামে জাতি ১০৬

www.bjilibrary.com

মুসলিম উম্মাহর মৌলিক বৈশিষ্ট্য : ১১০
আল্লাহমুখিতা ১১০
মধ্যপন্থা ১১১
দাওয়াহ ১১২
একতা ১১৫
উম্মাহ-চেতনা কোনো জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে লুপ্ত করে না ১১৮
স্বজাত্যবোধ (কওমিয়্যাত) সম্পর্কে ইমাম বান্নার দৃষ্টিভঙ্গি ১২১

ইমাম বান্নার দাওয়াতি আন্দোলনে জিহাদ ১২৫
জিহাদের অপরিহার্যতা ১২৮
ইসলামে জিহাদ ফরজ হওয়ার তাৎপর্য ১৩১
একটি ভ্রান্ত সংশয় ১৩৭

পরিশিষ্ট-১
ইসলামের ব্যাপকতা বিষয়ে দুটি পর্যবেক্ষণ ১৪৩
ব্যাপকতা বনাম বিভিন্ন অংশ ১৪৩
ব্যাপকতা মানে আমলের মর্যাদার বিভিন্নতাকে অবহেলা নয় ১৪৫

পরিশিষ্ট-২
ইখওয়ানের পঞ্চম সম্মেলনে ইমাম বান্নার বক্তব্য ১৫১
ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইসলাম ১৫১
ইখওয়ানুল মুসলিমিনের তত্ত্ব সকল সংস্কারকে ধারণ করে ১৫৮

www.bjilibrary.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইলাহের দপ্তর থেকে

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾ وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۚ وَأُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٥﴾

"তোমাদের মধ্যে অবশ্যই এমন একদল লোক থাকা উচিত, যারা মানুষকে আহ্বান করবে কল্যাণের দিকে, নির্দেশ দেবে ভালো কাজের এবং নিষেধ করবে মন্দ কাজ থেকে; আর এমন ব্যক্তিরাই তো সফলকাম। যাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং লিপ্ত হয়েছিল মতবিরোধে– তোমরা তাদের মতো হয়ো না। সেসব লোকদের জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি।" সূরা আলে ইমরান : ১০৪-১০৫

www.bjilibrary.com

ভূমিকা

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَصَلَاةً وَسَلَامًا عَلٰى صَفْوَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ. وَخَاتَمِ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ. سَيِّدِنَا وَإِمَامِنَا مُحَمَّدٍ. وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَتِهِ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ.

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অশেষ রহমত যে, ইমাম হাসান আল বান্নার সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। আমি তাঁর বেশকিছু বক্তব্য শোনার সুযোগ পেয়েছিলাম ।

১৯৪১ সাল। আমি চৌদ্দো বছর বয়সি প্রাণচঞ্চল কিশোর। আমি তখন তানতায় অবস্থিত আল আযহারের একটি ইনস্টিটিউটের ছাত্র। এক সভায় রাসূল সা.-এর হিজরতের ওপর আলোচনা করছিলেন ইমাম হাসান আল বান্না। বহু বছর ধরে আমাদের গ্রামে ওয়ায়েজ ও বক্তাদের কাছে হিজরতের ঘটনাবলি শুনে আসছিলাম; বিশেষ করে সওর গুহায় মাকড়সার জাল বোনা এবং কবুতরের ডিম পাড়ার ঘটনা তো বেশ শুনেছি। কিন্তু ইমাম হাসান আল বান্নার এই আলোচনা ছিল ভিন্ন ধাঁচের। ইমাম বান্না হিজরতকে দুটি যুগের সন্ধিক্ষণ হিসেবে ব্যাখ্যা করছিলেন। মক্কায় ব্যক্তি গঠনের যুগ এবং মদিনায় রাষ্ট্র ও সমাজ পরিগঠনের যুগ। দুটি যুগের বৈশিষ্ট্যাবলি এবং তা থেকে আমরা কীভাবে উপকৃত হতে পারি– সে বিষয়ে তিনি আলোচনা করছিলেন। এই আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল, যেন রাসূল সা.-এর দেখানো পথে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিগঠনের উপযোগী যোগ্য ব্যক্তিত্ব গঠনে আমরা কাজ করতে পারি।

ইমাম হাসান আল বান্নার সেই কথাগুলো আমার চিন্তা ও অন্তঃকরণে বড়োসড়ো নাড়া দিয়েছিল। এরপর থেকে আমি বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তানতায় তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করতাম। তাঁর সংস্পর্শ পাওয়ার এবং কথা শোনার জন্য আমি সীমাহীন উৎসাহ অনুভব করতাম। দূরত্বে অবস্থানের কারণে ইমামের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলাম বলে আমার বেশ আক্ষেপও ছিল।

www.bjilibrary.com

তাই নিকটস্থ কোথাও তাঁর আগমনের খবর পেলেই আমি ছুটে যেতাম। যদিও আমি তখন ইমাম বান্নার সংগঠন কিংবা তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতাম না।

বেশ কিছুদিন পরের কথা! আমি তখন ইনিস্টিটিউটের চতুর্থ বর্ষে অধ্যয়নরত। ইখওয়ানের ছাত্র শাখা আমাকে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানায় এবং একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতে অনুরোধ করে। আমি প্রবল উৎসাহ নিয়ে তাদের ডাকে সাড়া দিই। ইখওয়ানের মারকাযেই সর্বপ্রথম আমি কোনো মঞ্চে আরোহণ করি এবং একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করি। এতদিন পর সেই কবিতার প্রথম দু লাইন ছাড়া বাকি সবই স্মৃতি থেকে মুছে গেছে। সেই পঙ্‌ক্তিটি ছিল এমন–

قلبي يحس برحمة تتدفق

ويري الملائك حولنا قد أحدقوا

"আমার অন্তর রহমতে টগবগ করছে,
রহমতের ফেরেশতারা তাকিয়ে আছে অবাক হয়ে।"

সেদিন থেকে আমি ইখওয়ানের ছাত্র শাখার কর্মী হই। কিছুদিন পর দাওয়াহ বিভাগের সদস্য হই। আর উসতায বাহি আল খাওলি রহ. ছিলেন দাওয়াহ বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক।

তখন ইমাম হাসান আল বান্না কায়রোতে বসবাস করছেন। আমি তানতায় আল আযহারের অধীন ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা করছিলাম। এ কারণে ইমামের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ ছিল খুবই সীমিত এবং তা নির্ভর করত তানতা কিংবা আশপাশের কোনো শহরে বা পল্লিতে ইমামের সফরের ওপর।

আমি একটি দিনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। সেই দিনটি হবে তানতায় আমার উচ্চমাধ্যমিক পড়াশোনা শেষ হওয়ার দিন। এরপর আমি কায়রোয় আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হব এবং সেইসাথে ইমামের সরাসরি সাক্ষাৎ, সাহচর্য ও ছাত্রত্ব গ্রহণের সুযোগ পাব। কিন্তু তাকদির এর আগেই এ মহান ব্যক্তির জন্য মহান কিছু মজুদ করে রেখেছিল। আর তা ছিল আল্লাহর পথে শাহাদাত!

মর্মান্তিক সে খবর আমাদের হৃদয়ে বর্জ্রের মতো আঘাত হানে। তখন আমি কারাবন্দি। সেদিন আমাদের তানতা কারাগার থেকে হাকস্টেপ (Huckstep)

www.bjilibrary.com

কারাগার হয়ে তুর কারাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ক্যালেন্ডারের পাতায় সেদিন ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারির ১৩ তারিখ। খবরটি আমরা পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারি। বাদশাহ ফারুকের জন্মদিনের উপহার হিসেবে ইমামকে গুপ্তঘাতক পাঠিয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

আমি ইমামের সাহচর্য লাভের পরিকল্পনা করেছিলাম, কিন্তু তাকদিরের পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। এভাবে আমি ইমামুদ দাওয়াহর সরাসরি ছাত্রত্ব লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হই। আমি সেই ক্ষতিকে কিছুটা হলেও পুষিয়ে নিতে ভিন্নভাবে সচেষ্ট হই। আর তা হলো– ইমাম বান্নার রিসালা ও প্রবন্ধসমূহ থেকে উপকার হাসিল করতে আমি লেগে থাকি। ইমামের সেসব ছাত্র ও সাথিদের সাহচর্যের সুযোগ গ্রহণ করি– যারা তাঁর কাছ থেকে ইলম, আমল, গবেষণাপদ্ধতি ও আখলাক শিখেছেন; আমি তাদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ইমাম বান্নার ছাত্রত্ব গ্রহণ করি।

আমার সৌভাগ্য যে, জীবনে আমি বহু মহান ব্যক্তির সান্নিধ্য পেয়েছি, অনেকের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, অনেকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি! কিন্তু ইমাম হাসান আল বান্নার মতো বিরল বিস্ময়কর চরিত্রের মানুষ আর একজনকেও পাইনি। আল্লাহ তায়ালা তাকে অনন্য প্রতিভা ও যোগ্যতা দিয়েছিলেন– যা সাধারণত বহু মানুষের সমন্বয়ে একযোগে দেখা যায়। তিনি শিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব গঠনের সমন্বয় করেছেন। তত্ত্ব ও আন্দোলনের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। ধর্ম ও রাজনীতিকে একীভূত করেছেন। আধ্যাত্মিকতা ও জিহাদকে একই সুতোয় গেঁথেছেন। এককথায় ইমাম হাসান আল বান্না ছিলেন একজন জীবন্ত কুরআনি মানুষের নমুনা। ছিলেন একাধারে খোদাভীরু শিক্ষক, লড়াকু মুজাহিদ, যুগোপযোগী দাঈ, দক্ষ সংগঠক, সংগ্রামী রাজনীতিবিদ এবং সফল সমাজ সংস্কারক। প্রত্যেকটি অঙ্গনেই ইমাম বান্না অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন।

এটা কেবল আমার পর্যবেক্ষণ নয়; বরং ইমাম হাসান আল বান্নার সাথে যারা মিশেছেন, তারাই তাঁর এই বিস্ময়কর চরিত্রে আকৃষ্ট হয়েছেন। যে ব্যক্তি ইমাম বান্নার সাথে যত বেশি উঠাবসা ও মেলামেশা করেছে, তাঁর প্রতি তার ভক্তি ও আকর্ষণ তত বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি ইমাম বান্নার দাওয়াতি আন্দোলনের বহু নেতা ও যুবকদের সাথে থেকে এ বিষয়টি উপলব্ধি করেছি। তাদের মধ্যে রয়েছেন– উসতায বাহি আল খাওলি, মুহাম্মাদ আল গাযালি, সাইয়িদ সাবিক, আবদুল আযিয কামিল, ফরিদ আবদুল খালিক, উমর তিলমিসানি, মুসতফা মাশহুর, আব্বাস সিসি সহ আরও অনেকে।

www.bjilibrary.com

আবার অনেকে ইমাম হাসান আল বান্নাকে কাছ থেকে দেখেননি বটে, কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা, সংগঠন ও প্রশিক্ষণপদ্ধতি দেখে প্রভাবিত হয়েছেন। যেমন– সাইয়িদ কুতুব শহিদ।

ইমাম হাসান আল বান্নাকে 'গড়ার কারিগর' বলে আখ্যায়িত করেছেন সাইয়িদ কুতুব। তিনি ইমাম হাসান আল বান্নার উদ্ভাবিত ব্যতিক্রমী সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমিনের নিয়মানুবর্তিতা, গঠনপ্রণালি, সংগঠন কাঠামো, প্রশিক্ষণপদ্ধতি দেখে বিমোহিত হয়েছিলেন।

ইখওয়ানের তৃতীয় মুরশিদে আম উমর তিলমিসানির মতে, ইমাম হাসান আল বান্না ছিলেন 'আজন্ম প্রতিভা'।

আমি ইমাম হাসান আল বান্নার রচনাবলি মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করেছি। তাঁর প্রায় সব লেখাই আমি পড়েছি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইমাম বান্নার থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের উত্তরাধিকার রচনাসমগ্র আকারে প্রকাশিত হয়নি, যেমনটি জামাল উদ্দিন আফগানি, শাইখ মুহাম্মাদ আবদুহু, রাফআত তাহতায়িসহ অন্যদের রচনাবলির ক্ষেত্রে হয়েছে।[১]

ইমাম হাসান আল বান্নার ঋজু মৌলিক লেখাগুলো আমাকে উৎসাহী ও কর্মতৎপর করেছে। বিশেষ করে তাঁর রত্নসম লেখা– *রিসালাতুত তায়ালিম*।[২]

---

১. আজ থেকে প্রায় সতেরো বছর আগে প্রিয় ভাই আহমাদ সাইফুল ইসলাম বান্নার সাথে লন্ডনে আমার সাক্ষাৎ হয়। কথা প্রসঙ্গে আমি তাকে বলি– 'ইমাম হাসান আল বান্নার রিসালা, প্রবন্ধ, বিবৃতি এবং মঙ্গলবারের দারসসহ সকল রচনা একত্রিত করে রচনাসমগ্র প্রকাশ করা খুব জরুরি।' তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে বলেন, তিনি অচিরেই এ কাজটি সম্পন্ন করে প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন।

এটা আমাকে পীড়া দেয় যে, এত সময় চলে গেল, ইমাম বান্নার শাহাদাতের ৪০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারীরা বা তাঁর সংগঠন এই দায়িত্বটি সম্পন্ন করল না। ইমাম বান্নার তুরাস প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে উম্মাহর সম্পদ হয়ে থাকবে। সুতরাং তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা এবং তা থেকে সকলকে ফায়দা হাসিল করার সুযোগ করে দেওয়া জরুরি।

২. *রিসালাতুত তায়ালিম*-এর অনুবাদ প্রচ্ছেদ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলায় এর নামকরণ করা হয়েছে 'ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি ইমাম বান্নার নসিহত'। রিসালাটির অনুবাদ করেছেন সালমান খাঁ। –সম্পাদক

www.bjilibrary.com

এই রিসালাটির মধ্যে আন্দোলনের সমন্বিত কর্মতৎপরতার ভিত্তি রোপিত হয়েছে। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কর্মীদের সম্বোধন করে ইমাম বান্না এই রিসালাটি রচনা করেছেন। এর ভূমিকায় তিনি লিখেন–

> "এটি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মুজাহিদ ভাইদের প্রতি আমার পত্র– যারা ইখওয়ানের দাওয়াতের উচ্চমর্যাদা ও চিন্তার পবিত্রতায় আস্থাশীল, যারা এই দাওয়াতের ওপর প্রাণপণ দৃঢ় সংকল্পে আবদ্ধ হয়েছেন। এটি অধ্যয়ন করার মতো পাঠ নয় যে, মুখস্থ করতে হবে; বরং এটি এমন একগুচ্ছ নির্দেশিকা– যা বাস্তবায়ন করে দেখানোই বেশি জরুরি। আর অন্যদের জন্য এটি একটি বক্তব্য, বই, প্রবন্ধ কিংবা প্রদর্শক ও ব্যবস্থাপনা। কেননা, প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব অঙ্গন ও বিশেষ বিশেষ কাজের ক্ষেত্র। সুতরাং আপনারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আপনাদের জন্য উত্তম প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"

ইসলামি আন্দোলনের কাঙ্ক্ষিত মানের কর্মীদের উদ্দেশে লেখা এই রিসালাটি 'বাইয়াতের রুকন' শিরোনামে ১০টি রুকনকে অন্তর্ভুক্ত করে।[৩] যারা সহযোগী সদস্য থেকে কর্মী এবং কর্মী থেকে ইখওয়ান-সদস্য হতে চান, তাদেরকে সংগঠনের মূল দায়িত্বশীল কিংবা তার প্রতিনিধির কাছে এগুলোর ওপর বাইয়াত নিতে হয়। বাইয়াত নিতে হয় নিজের অঙ্গনে এই কাজগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা এবং এর দায়িত্বভার বহন করার। সেইসাথে এটি আরও অনেক কিছুর দাবি করে। যেমন– নির্দেশনা শোনা, আনুগত্য, আমানত, জিহাদ, কুরবানি, সাংগঠনিক কাজে সক্রিয়তা এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই পথে অবিচল থাকা ইত্যাদি।

এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় বাইয়াত নয়; আলোচ্য বিষয় 'আল ফাহম'। এখানে শুধু একটি রুকন 'আল ফাহম' (জ্ঞান-বোধ) নিয়েই আমাদের আলোচনা কেন্দ্রীভূত রাখব।

---

৩. *রিসালাতুত তায়ালিম*-এ ইখওয়ানুল মুসলিমিনের বাইয়াতের দশটি রুকন বর্ণিত হয়েছে। দশ রুকনের প্রথমটি হচ্ছে 'আল ফাহম' বা ইসলামের উপলব্ধি। আর 'আল ফাহম' বা ইসলামের উপলব্ধির জন্য প্রণীত হয়েছে 'আল উসুলুল ইশরুন' বা বিশ মূলনীতি। সেই বিশ মূলনীতির প্রথম মূলনীতিটি হলো– ইসলামের সামগ্রিকতা, পূর্ণাঙ্গতা ও ব্যাপকতা বিষয়ক। আর এই প্রথম মূলনীতির ব্যাখ্যাগ্রন্থই হচ্ছে– 'শুমুলুল ইসলাম' বা ইসলামের ব্যাপকতা। –সম্পাদক

www.bjilibrary.com

বিস্তৃত পাঠের সারসংক্ষেপ

যিনি এই উসুলগুলো পড়বেন এবং যথাযথভাবে অনুধাবন করবেন, তার যদি ইসলামি জ্ঞানের জগতে বিচরণ থাকে, তাহলে তিনি দৃঢ়ভাবে অনুভব করবেন– এটি একটি বিস্তৃত পাঠের সারসংক্ষেপ। কুরআন-সুন্নাহ, উসুলুল ফিকহ, উসুলুল আকিদা, ফিকহ ও তাসাউফের সারনির্যাস। দীর্ঘ পড়াশোনা ও গবেষণার পর বেরিয়ে আসা কিছু সংক্ষিপ্ত কথা– যা মূলনীতি প্রণয়ন এবং অধিক বিশুদ্ধ মতে উপনীত হওয়ার শক্তিসম্পন্ন।

ইমাম হাসান আল বান্না ছাত্রজীবনের শুরু থেকেই অপার সম্ভাবনাময় ছিলেন। ক্লাসে তিনি সব সময় প্রথম হতেন। তিনি প্রাচীন বিতর্কের দুটি ধারা– 'সালাফ' ও 'খালাফ'-এর মাযহাবে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। বিশেষ করে 'মানার' নামক সংস্কারবাদী চিন্তাধারার ওপর নিয়মিত নজর রাখতেন। ইমাম বান্নার চিন্তাধারা ছিল শাইখ মুহাম্মাদ আবদুহুর গতিশীল চিন্তার চেয়ে শাইখ রশিদ রিদার সুবিন্যস্ত চিন্তার নিকটবর্তী।

ইমাম হাসান আল বান্নার জ্ঞানগত আভিজাত্য সম্পর্কে কেউ জানতে চাইলে তাঁর সম্পাদিত 'আশ শিহাব' সাময়িকীর প্রকাশিত সংখ্যা পাঁচটি পড়তে পারেন। এ সাময়িকীর মাধ্যমে ইমাম বান্না তাঁর অনুসারী ও সহযোদ্ধাদের জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতা দূর করেছেন, যদিও তিনি পুস্তক রচনার চেয়ে ব্যক্তি গঠনে মনোনিবেশ করেছিলেন অধিক। এই সাময়িকীর বেশকিছু বিভাগের সম্পাদনা ইমাম বান্না নিজ হাতে করতেন।

ইমাম হাসান আল বান্না কোনো বিষয়ে লেখার পরিকল্পনা করলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লিখতেন। যেমন– আকিদা শুরু করতেন উলুহিয়াত দিয়ে। তাফসির শুরু করতেন সূরা ফাতিহা দিয়ে। উসুলে হাদিসে হাত দিলে রিওয়ায়াত ও ইসনাদ দিয়ে শুরু করতেন। ইসলামি সমাজব্যবস্থা নিয়ে লেখার সময় সালাম দিয়ে শুরু করতেন। ইতিহাস নিয়েও তিনি লিখেছেন। তিনি জ্ঞানের কোনো বিভাগে হাত দিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করে পাশ কাটিয়ে যেতেন না; বরং কোনো বিষয়ে আলোচনা করলে সেই বিষয়ের যথাযথ হক আদায় করেই আলোচনা করতেন।

এ কারণেই ইসলামি আন্দোলনের কর্মী, আলিম ও দাঈরা ইমাম হাসান আল বান্না রচিত 'রিসালাতুত তায়ালিম' কিংবা 'রুকনুল ফাহম' বা 'আল উসুলুল ইশরুন' (বিশ মূলনীতি) ব্যাখ্যা করার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন

www.bjilibrary.com

এবং একে যথাযথ গুরুত্বের সাথে নিয়েছেন। এই রিসালার সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা লিখেছেন বর্ষীয়ান আলিমে দ্বীন শাইখ আবদুল মুনয়িম আহমাদ তুয়াইলিব। তিনি দ্রুততম সময়ে পুরো রিসালাটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করেছিলেন।

পঞ্চাশের দশকের শুরুতে এই উসুলগুলোর ব্যাখ্যা নিয়ে আন্দোলনের দুই শীর্ষ নেতা উসতায বাহি আল খাওলি এবং আবদুল আযিয কামিল মতানৈক্য করেন। উসতায বাহি আল খাওলি মনে করতেন, ইমাম বান্নার তুরাস (মৌলিক লেখা) কাউকে ব্যাখ্যা করতে দেওয়া উচিত হবে না! বরং ইখওয়ান যাকে দায়িত্ব দেবে, কেবল তিনিই এর ব্যাখ্যা করবেন। নয়তো সকলে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করবে, আর তাতে চিন্তার বিভিন্নতা ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে। যেহেতু ইমাম বান্নার তুরাস ইখওয়ানের গঠনতন্ত্রসম, তাই এ নিয়ে দলের অবহেলা করা উচিত নয়। বিপরীতে উসতায আবদুল আযিয কামিলের মত ছিল– এভাবে শর্তারোপ করলে তা ইখওয়ান এবং ইখওয়ানের আলিমদের মধ্যে চিন্তার স্বৈরতন্ত্র বা এককেন্দ্রিকতা তৈরি করবে। এর মাধ্যমে চিন্তার গতিশীলতাকে বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হবে। সেইসাথে কিছু ব্যক্তিকে এ বিষয়ে যোগ্য অন্যান্য ব্যক্তিদের ওপর পোপের মতো ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হবে।

মজার ব্যাপার হলো, এই বিতর্কের কারণেই আমি এই রিসালার ব্যাখ্যা করার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠি। বিশেষ করে রুকনুল ফাহম তথা বিশ মূলনীতিকে গুরুত্বের সাথে নিই। আমি এগুলোর ব্যাখ্যা করতে মনস্থির করি। পরিকল্পনা করি, প্রতিটি বিষয়কে আলাদা আলাদা করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার।

সময়ের কাটায় তখন ১৯৫৬ সাল। সামরিক কারাগারে আমার কারাজীবনের শেষ দিনগুলো যাপন করছিলাম। কারাগারে এতদিন ধরে আমাদের ওপর বেশকিছু অযাচিত বিধিনিষেধ ছিল। শেষ সময়ে অতিরিক্ত বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল হয় এবং কিছু কিছু প্রত্যাহার করা হয়। ফলে আমরা একসাথে বসার সুযোগ পাই। কারাবন্দি ভাইদের সামনে আমি এই উসুলগুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করি। ভাইয়েরা আমাকে উৎসাহ দেন যে, বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর পড়ালেখার উপকরণ হাতে পেলে আমি যেন এগুলোর ব্যাখ্যা লিখি।

কাজটি করার প্রবল ইচ্ছা আমার মনে সব সময়ই ছিল। কিন্তু ১৯৬১ সালে আমাকে পাড়ি জমাতে হয় কাতারে। ১৯৬৫ সালের বিপর্যয়ের পর মিশরে ফেরার বারংবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই। ফলে কোথাও তিথু হয়ে কাজটিতে হাত দিতে আমার বেশ দেরি হয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

আমার অনেক সতীর্থ এ বিষয়ে লেখার কথা আমাকে মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দিতেন। তাদের কেউ কেউ চিঠি লিখেও উৎসাহ ও তাগাদা দিতেন। তাদের মধ্যে কুয়েতের ইসলামবিষয়ক প্রশাসনের প্রধান আবদুল্লাহ আকিল অন্যতম।

১৯৬৬ সালে জর্ডানের ইরবিদ শহরের একটি স্কুলে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের বড়োসড়ো এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অনেক নেতাকর্মীর সাথে সাক্ষাৎ হয় আমার। সে কর্মশালায় আলোচক হিসেবে দীর্ঘ সময় নিয়ে আমি উসুলুল ইশরিনের ব্যাখ্যা করি। আর এটা আমার ওয়াদা পূরণের পথে ছিল আরও একটি উদ্দীপনা। ততদিনে আমি বেশ কিছু উসুলের ব্যাখ্যা লিখে ফেলেছি। সেখানে উসুলগুলোর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ব্যাপারগুলো নিয়ে বিশদ আলোচনা করি, তবে সেগুলো খুব একটা গোছানো ও বিন্যস্ত ছিল না।

সত্তরের দশকের শুরুতে কায়রো থেকে শাইখ উমর তিলমিসানির সম্পাদনায় *দাওয়াহ* সাময়িকীটি পুনরায় প্রকাশিত হতে শুরু করে। আমি সেখানে প্রাথমিকভাবে লেখা প্রথম উসুলের ব্যাখ্যা প্রকাশ করতে শুরু করি। সেখানে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের ব্যাপকতার আলোচনা এসেছিল। কিছু সংখ্যায় প্রকাশের পর *দাওয়াহ* সাময়িকীতে আর লেখা পাঠানো হয়ে ওঠেনি।

বহুদিন ধরেই কিছু ভাই একটি ইলমি জলসার জন্য তাগাদা দিয়ে আসছিলেন। তাদের দাবি ছিল, আমি প্রত্যেকটি উসুল একটি একটি করে ব্যাখ্যা করব এবং সেগুলোর ওপর উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দেবো। তারা সেই আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব ক্যাসেটে রেকর্ড করবেন। বহুল প্রত্যাশিত লিখিত ব্যাখ্যা প্রকাশ হওয়ার আগ পর্যন্ত এই ক্যাসেট বিভিন্ন জায়গায় শোনানোর ব্যবস্থা করা হবে। তাদের এই দাবি একপর্যায়ে বাস্তব রূপ লাভ করে। উসুলুল ইশরিনের ব্যাখ্যার একটি আসর আয়োজন করা হয়। পুরো আসরটি ধারণ করা হয় ১৫টি ক্যাসেটে। কিছু ভাই এগুলো দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এরকম বহুল প্রচার-প্রসার আমার ধারণারও বাইরে ছিল। আলহামদুলিল্লাহ! প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু ভাই সেই ক্যাসেট থেকে উপকৃত হয়েছেন।[৪] বেশ কিছু প্রকাশক তা বই আকারে প্রকাশের অনুমতি চাইলেন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ লিখিত ব্যাখ্যা সম্পন্ন করার পূর্ব পর্যন্ত আমি বই প্রকাশের পক্ষে ছিলাম না।

---

৪. কিছু কিছু ভাই উসুলুল ইশরিনের ব্যাখ্যা করেছেন। তারা আমার রেকর্ডের সহযোগিতা নিয়েছেন বা একে ভিত্তি করেই বিভিন্ন সংজ্ঞা, বর্ণনা, উদাহরণ ও দলিল পেশ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বিষয়টি উল্লেখপূর্বক শুকরিয়া জানিয়েছেন, আবার কেউ কেউ বিষয়টির উল্লেখ এড়িয়ে গেছেন।

www.bjilibrary.com

গত কয়েক বছরে এই উসুলগুলোর বেশ কিছু ব্যাখ্যা প্রকাশ পেয়েছে। তার মধ্যে শাইখ মুহাম্মাদ আল গাযালির করা دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين (মুসলিম মননে ঐক্যের নীতিমালা) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর এই ব্যাখ্যাটি আমাকে কিছুদিনের জন্য অলস করে দিয়েছিল। বেশ কিছু সময় এ নিয়ে কাজ করতে আলসেমি করার সুযোগ পেয়ে যাই। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন; ফলে আমি লেখাটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হই।

উল্লেখ্য, একই বিষয়ের একাধিক ব্যাখ্যা হতে কোনো বাধা নেই। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। আমাদের পূর্ববর্তী আলিমদের মাঝে দেখেছি, তারা একই কিতাবের বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যায়, কম মানের ব্যাখ্যার ভেতরও এমন কিছু আলোচনা পাওয়া যায়, যা উচ্চ মানের ব্যাখ্যায়ও অনুপস্থিত থাকে।

এখানে আমি মূলনীতি স্পষ্টকরণ, বিশদ ব্যাখ্যা এবং দলিল উপস্থাপনের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। শাব্দিক বিশ্লেষণের চেয়ে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ওপর বেশি মনোনিবেশ করেছি। আমি ইসলামি জ্ঞানের উৎসগুলোর ওপর গবেষণা করে ওই লোকদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছি– যারা ইসলাম সম্পর্কে আসলেই জানত না কিংবা যাদের কাছে কিছু কিছু বিষয় অস্পষ্ট ছিল। বিতর্কিত, সংশয় ও দ্বিধার জায়গাগুলোতে আমি বেশি জোর দিয়েছি। সুস্পষ্ট অর্থজ্ঞাপক আয়াত-হাদিস ও ইসলামি জ্ঞানের চিরাচরিত মূলনীতির আশ্রয় নিয়েছি। বিশেষ করে উসুলুল হাদিস, উসুলুল ফিকহ, উসুলুত তাফসিরসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে যা হুকুম ও বুনিয়াদ হিসেবে এসেছে– তার সহযোগিতা নিয়েছি। বিশেষ কোনো শিক্ষাধারা বা মাযহাবের প্রতি একরোখা নন– এমন গভীর জ্ঞানের আলিমদের মতামত এনে স্বচ্ছতা রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। আর এসবের পেছনে রয়েছে আল্লাহপ্রদত্ত তাওফিক। জনৈক কবি বলেছেন–

إِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ اللهِ لِلْفَتَى + فَأَوَّلُ مَا يَجْنِي عَلَيْهِ اجْتِهَادُهُ

"যখন পাশে নেই আল্লাহর রহম-করম,
তখন যুবকের চেষ্টাও অবিচারের চরম।"

কিছু ভাই ধারাবাহিকভাবে এক বা একাধিক উসুলের ব্যাখ্যা বই আকারে প্রকাশের পরামর্শ দিয়েছেন। তারা বলেছেন, শেষে এটি একটি ভলিউম আকারে বা কয়েকটি খণ্ডে সাজাতে।

www.bjilibrary.com

আল্লাহর ওপর ভরসা করে প্রথম উসুলের ব্যাখ্যা হিসেবে প্রথম বইটি প্রকাশ করতে যাচ্ছি। আল্লাহ তায়ালার দরবারে দুআ করছি– তিনি যেন আমার লেখার হাত মজবুত রাখেন এবং সবগুলো খণ্ড প্রকাশের তাওফিক দেন। আমার চিন্তাগত ত্রুটি ও লেখার ভুলের জন্য ক্ষমা করে দেন। হে আল্লাহ! যদি আমাদের ইজতিহাদ সঠিক হয়, তবে আমাদের পূর্ণ সওয়াব দান করুন। আর ভুল হলেও সওয়াব থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না।

... رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

"হে আমাদের রব! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদের অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ওপর এমন কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমনটি আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর অর্পণ করেছ। হে আমাদের প্রভু! আমাদের দ্বারা এমন বোঝা বহন করিয়ো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের মার্জনা করো। আমাদের ক্ষমা করো। আমাদের প্রতি রহম করো। তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।" সূরা বাকারা : ২৮৬

আল্লাহর দরবারে ভিখারি
ইউসুফ আল কারযাভী
জিলকদ, ১৪১১ হিজরি
মে, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ

www.bjilibrary.com

আল উসুলুল ইশরুন

(বিশ মূলনীতি)

ইমাম হাসান আল বান্না বলেন–

"সত্যনিষ্ঠ কাফেলার প্রিয় ভাইয়েরা! আমাদের বাইয়াতের রুকন দশটি; আপনারা এগুলো মুখস্থ করে নিন–

الفهم والإخلاص والعمل والجهاد والتضحية والطاعة والثبات والتجرد والأخوّة والثقة.

ফাহম, ইখলাস, আমল, জিহাদ, কুরবানি, আনুগত্য, দৃঢ়তা, একাগ্রতা, ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বস্ততা।

আমরা 'আল ফাহম' বলতে উদ্দেশ্য করেছি– আপনারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখবেন যে, আমাদের চিন্তাকাঠামো ইসলামের বিশুদ্ধ দর্শন। আর ইসলামকে বোঝার জন্য আমরা বিশটি মূলনীতি প্রণয়ন করেছি– এই মূলনীতিসমূহের মাধ্যমে ইসলামকে অনুধাবন করা আপনাদের জন্য সহজতর হবে।

প্রথম মূলনীতি

الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء، وهو مادة وثروة أو كسب وغنى، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء.

"ইসলাম এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা– যা মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব, যেমনিভাবে ইসলাম সত্য আকিদা ও বিশুদ্ধ আমল, ঠিক তেমনিভাবে ইসলাম হচ্ছে– রাষ্ট্র ও দেশ তথা শাসনব্যবস্থা ও জাতি, আখলাক ও শক্তি (Power) তথা রহমত ও আদালত, সংস্কৃতি ও আইন তথা জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিচারব্যবস্থা, পুঁজি ও সম্পদ তথা উপার্জন ও প্রাচুর্য, জিহাদ ও দাওয়াত তথা সেনাবাহিনী ও আদর্শ। ইসলামে এই উভয় দিকই সমান গুরুত্বের দাবিদার।"

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় মূলনীতি

والقرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام. ويفهم القرآن طبقاً لقواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا تعسف. ويرجع في فهم السنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات.

ইসলামের বিধিবিধান জানার ক্ষেত্রে কুরআনুল কারিম ও পবিত্র সুন্নাহ হচ্ছে প্রত্যেক মুসলিমের প্রত্যাবর্তনস্থল। কুরআনুল কারিমকে আরবি ভাষার নিয়মাবলির আলোকে সকল প্রকার কৃত্রিমতা ও স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্ত হয়ে বুঝতে হবে। আর হাদিস বোঝার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত হাদিস বর্ণনাকারীদের দ্বারস্থ হতে হবে।

তৃতীয় মূলনীতি

وللإيمان الصادق والعبادة الصحيحة والمجاهدة نور وحلاوة يقذفهما الله في قلب من يشاء من عباده. ولكن الإلهام والخواطر والكشف والرؤى ليست من أدلة الأحكام الشرعية. ولا تعتبر إلا بشرط عدم اصطدامها بأحكام الدين ونصوصه.

সত্যনিষ্ঠ ঈমান, বিশুদ্ধ ইবাদত ও চেষ্টা-সাধনায় রয়েছে নূর ও সুমিষ্ট স্বাদ। আল্লাহ তায়ালা যাকে চান, তার অন্তরে এ নূর ও সুমিষ্ট স্বাদ ঢেলে দেন। কিন্তু ইলহাম, অন্তরের ঝোঁক-প্রবণতা, কাশফ ও স্বপ্ন শরিয়তের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে কোনো দলিল নয়। এগুলোর ওপর কেবল তখনই আস্থা রাখা যাবে, যখন এগুলো দ্বীনের আহকাম এবং নুসুসের (কুরআন ও সুন্নাহর উদ্ধৃতি) বিরোধী হবে না।

চতুর্থ মূলনীতি

والتمائم والرقى والودع والرمل والمعرفة والكهانة وادعاء معرفة الغيب. وكل ما كان من هذا الباب منكر تجب محاربته إلا ما كان آية من قرآن أو رقية مأثورة.

তাবিজ-কবচ, জাদু-টোনা, গলায় শঙ্খ ঝোলানো, হারিয়ে যাওয়া বস্তুর অবস্থান জানার দাবি করা, বালুতে দাগ টেনে কিংবা নক্ষত্রের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ গণনা, গাইবের জ্ঞান রাখার দাবি করা সহ এ জাতীয় যা কিছু আছে– তার সবই গর্হিত কাজ। এগুলো প্রতিহত করা আমাদের কর্তব্য। তবে যে সমস্ত রুকইয়া কুরআনের আয়াত বা হাদিসে বর্ণিত দুআর মাধ্যমে করা হয়– সেগুলোর কথা ভিন্ন।

www.bjilibrary.com

পঞ্চম মূলনীতি

ورأي الإمام ونائبه فيما لا نص فيه، وفيما يحتمل وجوها عدة وفي المصالح المرسلة معمول به ما لم يصطدم بقاعدة شرعية، وقد يتغير بحسب الظروف والعرف والعادات. والأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وفي العاديات الالتفات إلى الأسرار والحكم والمقاصد.

ইমাম (শাসক বা দায়িত্বশীল) বা তার প্রতিনিধির মতামত চলবে সে ব্যাপারে, যে ব্যাপারে নস নেই অথবা নস থাকলেও তা একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে এবং মাসলাহা মুরসালা ক্ষেত্রে। ইমাম বা তার প্রতিনিধির মতামতের ওপর তখনই আমল করা যাবে, যখন তা কোনো শরয়ি মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। আর স্থান, কাল, প্রচলিত রীতিনীতি এবং মানুষের অভ্যাসের আলোকে ইমামদের মতামত ভিন্ন হতে পারে। ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে– ইবাদতের কারণ বা উদ্দেশ্য না খুঁজে নিরেট অনুসরণ করে যাওয়া। আর অভ্যাসগত কর্মের ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে– তাৎপর্য, প্রজ্ঞা ও উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করা।

ষষ্ঠ মূলনীতি

وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء عن السلف رضوان الله عليهم موافقا للكتاب والسنة قبلناه، وإلا فكتاب الله وسنة رسوله أولى بالاتباع، ولكنا لا نعرض للأشخاص - فيما اختلف فيه - بطعن أو تجريح، ونكلهم إلى نياتهم وقد أفضوا إلى ما قدموا.

আল মাসুম (মুহাম্মাদ সা.) ছাড়া অন্য সবার কথা গ্রহণও করা যাবে, আবার বর্জনও করা যাবে। সালাফদের থেকে আসা যা কিছু কুরআন-সুন্নাহর সাথে মিলে যাবে– তা আমরা গ্রহণ করব। (আর যদি না মেলে, তাহলে) আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সা.-এর সুন্নাহই অনুসৃত হওয়ার অধিক দাবিদার। তবে মতপার্থক্যের কারণে আমরা কোনো ব্যক্তিকে বিদ্রুপ বা দোষারোপ করব না। আমরা তাদেরকে তাদের নিয়তের ওপর ছেড়ে দেবো। তারা তাদের কর্মের প্রতিদান পাবেন।

www.bjilibrary.com

সপ্তম মূলনীতি

ولكل مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلة الأحكام الفرعية أن يتبع إماما من أئمة الدين، ويحسن به مع هذا الاتباع أن يجتهد ما استطاع في تعرف أدلته، وأن يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل متى صح عنده صلاح من أرشده وكفايته، وأن يستكمل نقصه العلمي إن كان من أهل العلم حتى يبلغ درجة النظر.

যে সকল মুসলিম শাখাগত ফিকহি বিধিবিধানের দলিল যাচাই-বাছাই করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না, তারা ইমামদের মধ্য থেকে কোনো একজন ইমামের অনুসরণ করবে। তবে এর পাশাপাশি কোন বিধানের ক্ষেত্রে তার ইমামের দলিল কী– তা জানার চেষ্টা করাটা তার জন্য উত্তম হবে। আর তার উচিত হবে– দলিলনির্ভর সকল নির্দেশনাই মেনে নেওয়া, যদি দলিলদাতার সততা ও যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। তবে তিনি যদি আলিম হন, তাহলে তার উচিত হবে– জ্ঞানগত অপূর্ণতা দূর করে যাচাই-বাছাই করার স্তরে পৌঁছানো।

অষ্টম মূলনীতি

والخلاف الفقهي في الفروع لا يكون سبباً للتفرق في الدين، ولا يؤدي إلى خصومة ولا بغضاء ولكل مجتهد أجره، ولا مانع من التحقيق العلمي النزيه في مسائل الخلاف في ظل الحب في الله والتعاون على الوصول إلى الحقيقة، من غير أن يجر ذلك إلى المراء المذموم والتعصب.

শাখাগত মাসয়ালায় ফিকহি মতপার্থক্য কখনোই দ্বীনের মাঝে দলাদলির কারণ হবে না। এ মতপার্থক্য যেন কোনো প্রকার ঝগড়া ও হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি না করে। প্রত্যেক মুজতাহিদের জন্যই প্রতিদান রয়েছে। আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক মনোভাব লালন করে শাখাগত মাসয়ালায় প্রকৃত তাৎপর্য উদ্‌ঘাটনের জন্য বস্তুনিষ্ঠ ইলমি গবেষণায় কোনো সমস্যা নেই। তবে খেয়াল রাখতে হবে, এটা যেন নিন্দিত ঝগড়া ও গোঁড়ামির দিকে না নিয়ে যায়।

নবম মূলনীতি

وكل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها من التكلف الذي نهينا عنه شرعا، ومن ذلك كثرة التفريعات للأحكام التي لم تقع، والخوض في معاني الآيات القرآنية الكريمة

www.bjilibrary.com

التي لم يصل إليها العلم بعد، والكلام في الفاضلة بين الأصحاب رضوان الله عليهم وما شجر بينهم من خلاف، ولكل منهم فضل صحبته وجزاء نيته وفي التأول مندوحة.

যেসব মাসয়ালার ওপর আমল করার প্রয়োজন হয় না– এমনসব মাসয়ালা নিয়ে গভীর আলোচনা-পর্যালোচনায় লিপ্ত হতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে। যেমন– অসংঘটিত বিষয়ে অধিক পরিমাণ শাখা মাসয়ালা উদ্‌ঘাটন করা, কুরআনের এমনসব আয়াতের অর্থের পেছনে পড়ে থাকা, মানবজ্ঞান আজ অবধি যার কূল-কিনারা করতে পারেনি (অর্থাৎ, মুতাশাবিহাত আয়াত), সাহাবাদের মাঝে কার মর্যাদা কম এবং কার মর্যাদা বেশি– এ নিয়ে তর্ক করা, সাহাবাদের মাঝে সংঘটিত বিরোধ নিয়ে আলোচনা করা ইত্যাদি। সাহাবায়ে কিরামের প্রত্যেকেরই রয়েছে রাসূল সা.-এর সাহচর্যের কারণে বিশেষ মর্যাদা, নিয়তের কারণে প্রতিদান এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার অধিকার।

দশম মূলনীতি

ومعرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده وتنزيهه أسمى عقائد الإسلام. وآيات الصفات وأحاديثها الصحيحة وما يليق بذلك من التشابه. نؤمن بها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل، ولا نتعرض لما جاء فيها من خلاف بين العلماء، ويسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا) آل عمران:7.

আল্লাহ তায়ালার মারিফাত, তাঁর তাওহিদ এবং সকল প্রকার ত্রুটি থেকে তাঁর পবিত্রতা ইসলামি আকিদার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ তায়ালার সিফাত সম্পর্কিত আয়াত, সহিহ হাদিস এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট মুতাশাবিহাত আমরা সেভাবেই বিশ্বাস করি, যেভাবে তা বর্ণিত হয়েছে। আমরা এগুলোকে ব্যাখ্যাও করি না, বাতিলও করি না। এ ব্যাপারে আলিমদের মাঝে হওয়া মতবিরোধ থেকে আমরা যথাসম্ভব দূরে থাকব। এক্ষেত্রে রাসূল সা. ও সাহাবিদের এ মনোভাব অনুসরণ করাই আমরা যথেষ্ট মনে করি–

> 'আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলে– আমরা এগুলোতে ঈমান রাখি। আর এর সবই আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে।' (সূরা আলে ইমরান : ৭)

www.bjilibrary.com

একাদশ মূলনীতি

وكل بدعة في دين الله لا أصل لها ـ استحسنها الناس بأهوائهم سواء بالزيادة فيه أو بالنقص منه ـ ضلالة تجب محاربتها والقضاء عليها بأفضل الوسائل التي لا تؤدي إلى ما هو شر منها.

আল্লাহর দ্বীনের মাঝে নব-আবিষ্কৃত প্রতিটি ভিত্তিহীন বিষয়ই হচ্ছে ভ্রষ্টতা। মানুষ তাদের প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী দ্বীনের মাঝে বাড়িয়ে বা কমিয়ে এগুলো তৈরি করেছে এবং এগুলোকে ভালো মনে করে গ্রহণ করেছে। এসব বিদআতের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া আবশ্যক। এগুলোকে প্রতিহত করতে হবে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। সেইসাথে খেয়াল রাখতে হবে– এগুলোর সমাধান করতে গিয়ে আবার এরচেয়েও খারাপ পরিস্থিতির সৃষ্টি যেন না হয়।

দ্বাদশ মূলনীতি

والبدعة الإضافية والتركية والالتزام في العبادات المطلقة خلاف فقهي. لكل فيه رأيه، ولا بأس بتمحيص الحقيقة بالدليل والبرهان.

আল বিদআতুল ইযাফিয়্যাহ (সংযোজনমূলক বিদআত), আল বিদআতুত তারকিয়্যাহ (পরিত্যাগমূলক বিদআত) এবং নির্দিষ্ট কোনো ইবাদতে নিরন্তর লেগে থাকা ফিকহি মতবিরোধের আওতায় পড়বে। এ ব্যাপারে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ মতামত রয়েছে। তবে দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে প্রকৃত সত্যকে উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টা দোষণীয় নয়।

ত্রয়োদশ মূলনীতি

ومحبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب أعمالهم قربة إلى الله تبارك وتعالى. والأولياء هم المذكورون بقوله تعالى (الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ). والكرامة ثابتة بشرائطها الشرعية. مع اعتقاد أنهم رضوان الله عليهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا في حياتهم أو بعد مماتهم فضلا عن أن يهبوا شيئا من ذلك لغيرهم.

www.bjilibrary.com

নেককারদের ভালোবাসা এবং তাদের উত্তম কর্মের প্রশংসা করা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের মাধ্যম। ওলি তো তারাই, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– 'যারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে' (সূরা ইউনুস : ৬৩)। আর (ওলিদের) কারামত কিছু শরয়ি শর্তের আলোকে প্রমাণিত বিষয়। তবে কারামতের ক্ষেত্রে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে– তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট, কিন্তু তারা জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পরে নিজেদের কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না; অন্যের উপকার বা ক্ষতি করা তো আরও সুদূর পরাহত বিষয়।

চতুর্দশ মূলনীতি

وزيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة. ولكن الاستعانة بالمقبورين أيا كانوا ونداؤهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم وتشييد القبور وسترها وإضاءتها والتمسح بها والحلف بغير الله وما يلحق بذلك من المبتدعات كبائر تجب محاربتها. ولا نتأول لهذه الأعمال سدا للذريعة.

সুন্নাহসম্মত পদ্ধতিতে যে কারও কবর জিয়ারত বৈধ অনুশীলন। কিন্তু কবরবাসীদের (যে-ই হোক না কেন) কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা, সহযোগিতার জন্য দুআ করা, নিকট বা দূর থেকে তাদের কাছে প্রয়োজন পূরণের দাবি করা, তাদের জন্য মানত করা, কবরের ওপর দালান নির্মাণ, কবরকে আবৃতকরণ, কবরে আলো জ্বালানো, কবরে শরীর মাসেহ করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে শপথ করাসহ এ ধরনের যত বিদআত আছে– সবগুলোই কবিরা গুনাহ। এগুলো প্রতিরোধ করা আবশ্যক। এ কাজগুলোকে আমরা সাদ্দুয যারায়ি[৫] হিসেবে ব্যাখ্যা করার পক্ষপাতী নই।

---

৫. সাদ্দুয যারায়ি মানে পথরুদ্ধকরণ। হারামের দিকে নিয়ে যায় এমন বৈধ কাজ নিষিদ্ধ করাকে সাদ্দুয যারায়ি বলে। আরবি 'সাদ্দুন' মানে– বাঁধ বা প্রতিবন্ধকতা। আর 'যারায়ি' শব্দটি 'যারিয়া' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ– পথ বা পদ্ধতি। সুতরাং সাদ্দুয যারায়ি মানে পথ রুদ্ধকরণ। ইসলামি শরিয়াহর পরিভাষায়– বাহ্যিকভাবে হালাল কিন্তু হারামের দিকে নিয়ে যায়, এমন বিষয়াদি নিষিদ্ধ করাকে সাদ্দুয যারায়ি বলা হয়। এক্ষেত্রে কাজটি বাহ্যত বৈধ, কিন্তু অবৈধ কাজের দিকে ধাবিত করে এবং তার শেষ পরিণতি হারাম বলে তাকে নিষিদ্ধ গণ্য করা হয়। হাম্বলি ও মালিকি মাযহাবে সাদ্দুয যারায়ি শরিয়াহর আনুষঙ্গিক দলিলের অন্তর্ভুক্ত। হানাফি ও শাফিয়ি মাযহাবে এটাকে সরাসরি দলিল বলা না হলেও এর ভিত্তিতে মাসয়ালা এসেছে। –অনুবাদক

www.bjilibrary.com

পঞ্চদশ মূলনীতি

والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة.

কোনো সৃষ্টিকে ওসিলা করে আল্লাহর কাছে দুআ করা হচ্ছে দুআর পদ্ধতি-সংক্রান্ত শাখাগত ফিকহি মতপার্থক্য। এটা আকিদার কোনো মাসয়ালা নয়।

ষোড়শ মূলনীতি

والعرف الخاطئ لا يغير حقائق الألفاظ الشرعية، بل يجب التأكد من حدود المعاني المقصود بها، والوقوف عندها، كما يجب الاحتراز من الخداع اللفظي في كل نواحي الدنيا والدين، فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء.

ভুল উরফ বা প্রচলন শরয়ি শব্দের হাকিকতকে পরিবর্তন করে না। বরং শব্দ দিয়ে উদ্দিষ্ট অর্থের সীমারেখাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং এই সীমারেখার মাঝেই অবস্থান করা বাঞ্ছনীয়। একইভাবে দ্বীন ও দুনিয়াবি সকল ক্ষেত্রে শাব্দিক ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কোনো কিছুর নাম বা শিরোনাম মূল বিবেচ্য নয়। মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে –ওই নাম বা শিরোনাম– যা মর্মার্থ ধারণ করে।

সপ্তদশ মূলনীতি

والعقيدة أساس العمل، وعمل القلب أهم من عمل الجارحة، وتحصيل الكمال في كليهما مطلوب شرعاً وإن اختلفت مرتبتا الطلب.

আকিদা হচ্ছে আমলের ভিত্তিস্বরূপ। বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলের চেয়ে কলবের আমল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ উভয় আমলের ক্ষেত্রেই পরিপূর্ণতা আনয়ন শরিয়তের দাবি; যদিও দাবির মাত্রা ভিন্ন।

অষ্টাদশ মূলনীতি

والإسلام يحرر العقل، ويحث على النظر في الكون، ويرفع قدر العلم والعلماء، ويرحب بالصالح والنافع من كل شيء، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها.

www.bjilibrary.com

ইসলাম আকল বা চিন্তার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। ইসলাম বিশ্বজগৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে উৎসাহিত করে, জ্ঞান ও জ্ঞানীদের মর্যাদা সমুন্নত করে এবং সকল উপকারী ও কল্যাণকর ব্যাপারকে স্বাগত জানায়। জ্ঞান মুমিনের হারানো সম্পদ; যেখানেই তা পাওয়া যাক না কেন, সে-ই এর অধিক হকদার।

ঊনবিংশ মূলনীতি

وقد يتناول كل من النظر الشرعي والنظر العقلي ما لا يدخل في دائرة الآخر، ولكنهما لن يختلفا في القطعي، فلن تصطدم حقيقة علمية صحيحة بقاعدة شرعية ثابتة، ويؤول الظني منهما ليتفق مع القطعي، فإن كانا ظنيين فالنظر الشرعي أولى بالاتباع حتى يثبت العقلي أو ينهار.

কখনও কখনও শরয়ি দৃষ্টিভঙ্গি আকলি দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত হতে পারে, কিন্তু অকাট্য বিষয়াবলিতে শরয়ি দৃষ্টিভঙ্গি কখনও একটি অপরটির বিপরীত হবে না। অতএব, বিশুদ্ধ জ্ঞানগত বাস্তবতা কখনও প্রতিষ্ঠিত শরয়ি নীতির সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। উভয়টির যন্নি (সংশয়যুক্ত বিষয়গুলো)-কে কাতয়ি (অকাট্য বিষয়াদি)-র আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে। আর উভয়টিই যদি যন্নি হয়, তাহলে শরয়ি দৃষ্টিভঙ্গিই অনুসৃত হওয়ার অধিক হকদার– যতক্ষণ না আকলি দৃষ্টিভঙ্গি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় কিংবা বাতিল প্রমাণিত হয়।

বিংশ মূলনীতি

ولا نكفر مسلماً أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض - برأي أو بمعصية - إلا إن أقر بكلمة الكفر، أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة، أو كذب صريح القرآن، أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال، أو عمل عملاً لا يحتمل تأويلاً غير الكفر.

আমরা এমন কোনো মুসলিমকে তার কোনো মতামত বা পাপাচারের কারণে তাকফির করব না– যে দুই শাহাদাতকে স্বীকার করে নিয়েছে; সেইসাথে শাহাদাতের দাবি অনুযায়ী আমল করে এবং ফরজগুলো ঠিকঠাক আদায় করে। তবে সে যদি কোনো কুফরি কথার স্বীকৃতি দেয় বা দ্বীনের অকাট্য কোনো বিষয় অস্বীকার করে কিংবা কুরআনের সুস্পষ্ট কোনো আয়াতকে মিথ্যারোপ করে অথবা আরবি ভাষারীতিতে কোনো সম্ভাবনা রাখে না এমনভাবে কুরআনের ব্যাখ্যা করে বা এমন কাজ করে– যা কুফরি ভিন্ন অন্য কোনো কিছুর সম্ভাবনা রাখে না, তাহলে ভিন্ন কথা।

www.bjilibrary.com

আর যখন আমার মুসলিম ভাই এই বিশটি মূলনীতির মাধ্যমে তার দ্বীনকে জানতে পারবে, সে তার শাশ্বত স্লোগানের মর্ম উপলব্ধি করতে পারবে–

والقرآن شرعتنا.

والرسول قدوتنا.

কুরআন আমাদের সংবিধান

রাসূল সা. আমাদের নেতা...।"

– হাসান আল বান্না

www.bjilibrary.com

বিশ মূলনীতি : প্রাসঙ্গিক বুনিয়াদি আলাপ

'রুকনুল ফাহম'-কে সর্বাগ্রে আনার কারণ

এ উসুলগুলো ব্যাখ্যা করার পূর্বে আমরা কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে চাই, যে প্রশ্নগুলো অনেকের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে।

পাঠকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে– ইমাম হাসান আল বান্না কেন ইখলাস, আমল, কুরবানি, ইসতিকামাত ও জিহাদের মতো রুকনগুলোর পূর্বে 'ফাহম'-কে প্রথম রুকন করেছেন? (ফাহম মানে বুঝ, বোধ বা উপলব্ধি। ইমাম বান্না এখানে ইলম বোঝাতে 'ফাহম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন)।

মূলত ইমাম বান্না সচেতনভাবেই ফাহমকে প্রথমে এনেছেন। তিনি 'ফিকহুল আওলাবিয়্যাত' (অগ্রাধিকারের ফিকহ)-এ যথেষ্ট বিচক্ষণ ছিলেন। তাই যে রুকন আগে আসার দাবি রাখে, সেই রুকনকেই তিনি আগে এনেছেন।

চিন্তা বা তত্ত্ব যেকোনো কাজের পূর্বশর্ত। এটা চির সত্য বিষয়। সঠিক পদক্ষেপ ও সুষ্ঠু কাজের পূর্বশর্ত হলো– সঠিক উপলব্ধি ও পরিকল্পনা। এ কারণেই ইলম বা জ্ঞান মুসলিমদের কাছে আমলের আগে স্থান পায়। সহজ করে বলতে গেলে– ইলম হলো ঈমান ও সঠিক বিশ্বাসের পথনির্দেশক।

ইমাম গাযালিসহ শীর্ষস্থানীয় সুফিরা মনে করতেন, তিনটি জিনিসের মিশ্রণ ছাড়া দ্বীনের সজ্জায় সজ্জিত হওয়া বা নবি ও সিদ্দিকিনের চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া সম্ভব হয় না। আর তা হলো– ইলম, হাল, আমল। ইলম একটি হালের (অবস্থা) জন্ম দেয়। আর সেই হাল আমল বা কর্মের দিকে নিয়ে যায়।

এটি অবিকল মনোবিজ্ঞানীদের অনুরূপ কথা। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করে, উপলব্ধি, আবেগ ও আগ্রহ– এ তিনটি একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মানুষ প্রথমে কোনো কিছু সম্পর্কে জানে এবং উপলব্ধি করে। এরপর তা থেকে ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক আবেগ তৈরি হয়। অতঃপর মানুষ কোনো কাজ করতে বা সেই কাজ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেয়।

www.bjilibrary.com

এই ধারাবাহিকতার বিষয়টি কুরআনুল কারিমেও প্রায় একইভাবে এসেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ..﴿٥٤﴾

"যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তারা যেন জানতে পারে যে– এটা আপনার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য। অতঃপর তারা যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন তার প্রতি অনুগত হয়।"
সূরা হাজ : ৫৪

আয়াতে ব্যবহৃত فاء ধারাবাহিকতা ও ক্রমধারার অর্থ বহন করে (فاء-এর আগে যা আসে, তা আগে ঘটবে এবং পরে যা আসে, তা পরে ঘটবে)। অর্থাৎ, ইলমের ধারাবাহিকতায় ঈমান এবং ঈমানের ধারাবাহিকতায় আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ। জ্ঞানার্জন করার ফলে কেউ ঈমান আনবে; আর ঈমান তাকে রবের দরবারে আত্মসমর্পণ করাবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরও বলেন–

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَ مَثْوٰىكُمْ ﴿١٩﴾

"অতঃপর (হে রাসূল!) ভালো করে জেনে রাখুন, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আর আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার নিজের জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্য। আর (হে মানুষ!) আল্লাহ তোমাদের তৎপরতার খবর রাখেন এবং (শেষ) গন্তব্যও জানেন।"
সূরা মুহাম্মাদ : ১৯

এখানে আল্লাহ তায়ালা জ্ঞানার্জনের আদেশসূচক فَاعْلَمْ শব্দটি আয়াতে উল্লেখিত ইসতিগফার ও আমলের পূর্বে এনেছেন।

ইমাম বুখারি রহ. তাঁর সংকলনে কিতাবুল ইলমের একটি অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন باب العلم قبل القول والعمل (কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান)। এতে উপর্যুক্ত আল্লাহর বাণী– فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ... -এর প্রতিফলন ঘটেছে। এখানে ইমাম বুখারি রহ. ইলম দিয়ে শুরু করেছেন। ব্যাখ্যাকারদের মতে– ইমাম বুখারি মূলত বলতে চেয়েছেন, কথা ও কাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইলম

www.bjilibrary.com

থাকা শর্ত। জ্ঞান ছাড়া এ দুটোকে বিবেচনা করা হবে না। ইলমকে অবশ্যই এ দুটোর আগে আসতে হবে। কারণ, ইলমই আমল শুদ্ধকারী নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে। ইমাম বুখারি রহ. এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন, যেন "আমলবিহীন ইলম কোনো উপকারে আসবে না" কথাটা ইলম তথা জ্ঞানার্জনকে হালকা বা তুচ্ছ করতে না পারে।[৬]

ওপরের আয়াতটি যদিও রাসূল সা.-কে সম্বোধন করে নাযিল করা হয়েছে, কিন্তু আয়াতটি সমগ্র উম্মাহর জন্যই প্রযোজ্য।

মানুষের একটি বড়ো সমস্যা হলো, তারা অনেক বিষয়কে একসাথে গুলিয়ে ফেলে। অনেকসময় তারা বাতিলকে হক মনে করে। বিদআতকে মনে করে সুন্নাত। এমনকি কোনো কোনো সময় নিজের খারাপ কাজটি তার কাছে সুন্দর মনে হয়; আর তা ভালো কাজ ভেবে সে করতেই থাকে। আল্লাহ তায়ালা রাসূল সা.-কে সম্বোধন করে বলেন–

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

"বলুন– আমি কি তোমাদের সংবাদ দেবো তাদের ব্যাপারে, যারা কাজেকর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত? এরাই তারা, যাদের পার্থিব জীবনেই সব প্রচেষ্টা পণ্ড হয়ে যায়; যদিও তারা মনে করে– তারা ভালো কাজই করছে।" সূরা কাহফ : ১০৩-১০৪

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরও বলেন–

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ۭ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاۗءُ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ...﴿٨﴾

"যার কাছে তার মন্দকাজ চাকচিক্যময় করে দেওয়া হয় এবং সে সেটাকে উত্তম মনে করে (সে কি সঠিক পথের অনুসারীর সমতুল্য)? নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন, আর যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখান।" সূরা ফাতির : ৮

---

৬. সহিহ বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থ *ফাতহুল বারি*, দারুল ফিকর (শাইখ আবদুল আযিয বিন বাজের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত সালাফিয়্যাহ প্রকাশনের ফটোকপি ছাপা)।

www.bjilibrary.com

একটি মাসনুন দুআ আছে এমন–

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ.

"হে আল্লাহ! সত্যকে আমাদের কাছে সত্য হিসেবে দেখান এবং তার অনুসরণের সক্ষমতা দান করুন। আর বাতিলকে বাতিল হিসেবে দেখান এবং তা থেকে বেঁচে থাকার সামর্থ্য দান করুন।"

হাদিসে এমন এক সময়ের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে, যখন ভালোকে মন্দ বলে পরিগণিত করা হবে, আর মন্দকে বিবেচনা করা হবে ভালো হিসেবে। এ ধরনের পরিণতির পেছনে কারণ হবে– ইলমের স্বল্পতা। এ কারণেই হাদিসের এমন কোনো কিতাব পাওয়া যায় না, যেখানে ইলমের অধ্যায় নেই। যেমন– বুখারি, মুসলিম, তিরিমিযি ইত্যাদি প্রত্যেকটি হাদিসগ্রন্থেই ইলমের আলাদা অধ্যায় রয়েছে।

ইমাম গাযালি রহ. রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*-এর ৪০টি অধ্যায়ের প্রথমটিই হলো ইলমের অধ্যায়। ইমাম গাযালি রহ. তাঁর অপর বিখ্যাত গ্রন্থ *মিনহাজুল আবিদিন*-এ বলেন–

"আল্লাহর পথের পথিককে সর্বপ্রথম যে প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করতে হয় তা হলো– জ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা।"

প্রবীণ খোদাভীরু আলিমগণ ইলমের পাথেয় সংগ্রহের পূর্বে ইবাদতের গণ্ডিতে পা রাখার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. বলেন–

"যে ব্যক্তি জ্ঞান ছাড়া কাজে নেমে পড়ে, সে যতটুকু সংস্কার করবে, তার চেয়েও বেশি বিনাশ করবে।"[৭]

ইমাম হাসান বসরি রহ. বলেন–

"ইলম ছাড়া যে ব্যক্তি কাজে লেগে যায়, সে পথহারা মুসাফিরের মতো। সে যতটুকু নির্মাণ করে, তার চেয়ে বেশি ধ্বংস করে। তোমরা জ্ঞানার্জন করো, যেন তোমাদের ইবাদত নষ্ট হয়ে না যায়। তোমরা ইবাদতে মগ্ন হও, যেন তোমাদের ইলম নষ্ট না হয়। একটি গোষ্ঠী ইলম ত্যাগ করে

৭. *সিরাতু উমর ইবনি আবদিল আজিজ ওয়া মানাকিবুহু*, ইবনুল জাওযি, পৃষ্ঠা : ২৫০

www.bjilibrary.com

ইবাদতে মগ্ন হয়েছিল। অতঃপর তাদের তরবারি উম্মতে মুহাম্মাদির ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে। আফসোস! যদি তারা জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করত, তবে তাদের জ্ঞান কখনও এমন গর্হিত কাজের অনুমতি দিত না।"[৮]

ইমাম হাসান বসরি রহ. এখানে খারিজিদের তৎপরতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। খারিজিরা উম্মাহর জান-মালকে হালাল ঘোষণা করেছিল। ঢালাওভাবে মানুষকে কাফির আখ্যা দিয়েছিল। তারা নিজেরা অনেক বেশি সাওম, তাহাজ্জুদ ও কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন থাকত। নিজেদের সিয়াম ও কিরাআতের আধিক্যের অহমিকায় তারা অন্যদের সিয়াম ও কিরাআতকে তুচ্ছ জ্ঞান করত। খারিজিদের সমস্যা ছিল– তারা কুরআন তিলাওয়াত করত, কিন্তু তা কণ্ঠনালির নিচে নামত না। অর্থাৎ, কুরআনের জ্ঞান তাদের উপলব্ধিতে আসত না; কুরআনের সরোবরে তাদের হৃদয় অবগাহন করতে পারত না। আর এ কারণে শেষ পর্যন্ত খারিজিরা ইসলামের অনুসারীদের হত্যা করেছে, আর মূর্তিপূজারিদের ছেড়ে দিয়েছে।[৯]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝলাম, ইলম অবশ্যই আমলের আগে। সাইয়িদুনা মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেছেন–

العلم إمامُ العملِ والعملُ تابعُه.

"ইলম হলো আমলের ইমাম, আর আমল তার অনুসারী।"[১০]

একবার রাসূল সা.-এর সামনে দুজন ব্যক্তির ব্যাপারে আলোচনা করা হলো। একজন আবিদ, আরেকজন আলিম। রাসূল সা. বললেন–

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ.

"আবিদের ওপর আলিমের মর্যাদা তোমাদের সাধারণ্যের ওপর আমার মর্যাদার মতো।"[১১]

---

৮. *মিফতাহু দারিস সায়াদা*, ইবনুল কাইয়িম, পৃষ্ঠা : ৮৩/১

৯. দেখুন, আবু সায়িদ খুদরি রা. বর্ণিত মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদিস, আল লুলু ওয়াল মারজান : ৬৩৯ এবং তার পরপর।

১০. আবু নাঈম *আল হুলইয়া*-তে, ইবনে আবদিল বার *আল ইলম*-এ আছারটি বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ এ বর্ণনাকে মারফু বলেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মাওকুফ।

১১. তিরমিযি আবু উমামা রা. থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেন এবং বলেন– এটা হাসান সহিহ গরিব : ২৬৮৬; হিমস সংস্করণ।

www.bjilibrary.com

একজন মুসলিমের ওপর ইসলামি শরিয়তের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। এটা তার মৌলিক প্রয়োজনসমূহের একটি। অনেক সালাফ মনে করতেন– 'মানুষের জন্য খাবার-পানীয়ের চেয়েও ইলম বেশি জরুরি।' কথাটি অবশ্যই সঠিক। কারণ, খাবার-পানীয় ছাড়া মানুষের শরীর ধ্বংস হয়ে যায়। আর জ্ঞান ছাড়া রুহ ধ্বংস হয়ে যায়। রুহের তুলনায় শরীর আর আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের তুলনায় দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের মূল্যই-বা কতটুকু!

মুসলিমদের কাছে ইলমের প্রয়োজনীয়তার কিছু দিক নিম্নরূপ :

এক. আকিদায় হক-বাতিল ও চিন্তায় ভুল-শুদ্ধ নিরূপণের একমাত্র মাধ্যম ইলম। ইলমের মাধ্যমে সঠিক বুঝ ও দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

দুই. আমলের মাঝে বৈধ-অবৈধ পার্থক্য করার একমাত্র মাধ্যম ইলম। অর্থাৎ, ব্যবহারিক জীবনে হালাল-হারাম নির্ণয়, ইবাদতে সুন্নাত-বিদআত পার্থক্যকরণ এবং চারিত্রিক বিষয়ে ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাধ্যম হলো ইলম। একমাত্র ইলমই এসব ব্যাপারে নীতিমালা প্রণয়ন করে।

তিন. ইলম শরয়ি আমলের মর্যাদা নিরূপণ করে। কোন আমলের অবস্থান কোথায়, তা নির্ধারণ করে। যেমন– পালনীয় আমলসমূহের মাঝে কোনটা ফরজ, কোনটা ওয়াজিব, কোনটা মুস্তাহাব এবং কোনটা ফরজে আইন আর কোনটা ফরজে কিফায়া, কোনটা সাধারণ ফরজ, আর কোনটা অধিকতর জরুরি ফরজ ইত্যাদি নির্ণয় করে। যেমন– ইসলামের রুকনসমূহ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের দাবিদার। নিষিদ্ধ বিষয়াদিতে কোনটা মাকরুহ অথবা মাকরুহের মতো আর কোনটা হারাম, এসবের অবস্থান নির্ণয়ের মাধ্যমও ইলম। আবার হারামের মাঝেই আছে কয়েক স্তর– সগিরা, কবিরা ও আকবারুল কাবায়ির (সর্বোচ্চ পর্যায়ের গুনাহ)।

চার. ইলম হলো ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন ঘটনা ও প্রেক্ষাপটের যথাযথ মূল্যায়নের একমাত্র মাধ্যম। মোহ, ক্ষোভ, প্রান্তিকতা ও সীমালঙ্ঘনের উর্ধ্বে উঠে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাধ্যমও ইলম।

www.bjilibrary.com

'ইলম'-এর পরিবর্তে 'ফাহম' শব্দ ব্যবহারের কারণ

ইমাম হাসান আল বান্না ইসলামের উপলব্ধি বা জ্ঞান বোঝাতে গিয়ে 'ইলম' শব্দের পরিবর্তে 'ফাহম' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কারণ, জ্ঞানের উদ্দেশ্যই হলো বুঝ বা উপলব্ধি। সুতরাং, অনেক বেশি জানাটাই প্রকৃত জ্ঞান নয়; বরং গভীর উপলব্ধিই হলো আসল জ্ঞান। কুরআন-সুন্নাহও কল্যাণ (خير)-এর জন্য দ্বীনের গভীর উপলব্ধি (تفقه في الدين)-কে শর্তায়িত করেছে; শুধু দ্বীনের জ্ঞানার্জন বা ইলমকে শর্ত করেনি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

"সমস্ত মুমিনের একত্রে অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়। অতএব, তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন দ্বীনের সমঝ অর্জনের জন্য যাত্রা করল না! (ইলমের পথে এই অভিযাত্রা) এজন্য যে– তারা (জ্ঞানার্জন করে) ফিরে এসে তাদের স্বজাতিকে সতর্ক করবে, যেন তারা সাবধান হতে পারে।" সূরা তাওবা : ১২২

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন–

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর উপলব্ধি দান করেন।"[১২]

উক্ত আয়াতে কারিমা ও হাদিসে জ্ঞানীদের মর্যাদা বর্ণনার জন্য 'ফিকহ' শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। আর 'ফিকহ' জ্ঞানের একটি বিশেষ ধাপ। 'ফিকহ' শব্দটিকে গভীর উপলব্ধি বা সূক্ষ্ম অনুধাবন বলে ব্যাখ্যা করা যায়– যা মানুষের উপলব্ধির অবয়বকে পূর্ণতা দেয়, বিচারবুদ্ধিকে আলোকিত করে আর হৃদয়কে জাগরিত করে।[১৩]

---

১২. মুত্তাফাকুন আলাইহি; রাবি : মুয়াবিয়া রা.।

১৩. ইমাম গাযালি রহ. তাঁর *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন* গ্রন্থের ইলম অধ্যায়ে বলেন– ফিকহ বলতে কুরআন-সুন্নাহ যা নির্দেশ করে তাকেই বোঝায়। সাহাবায়ে কিরাম ও উম্মাহর সালাফগণ কুরআন-সুন্নাহ থেকে যে বুঝ অর্জন করেছেন, তারই প্রতিশব্দ হিসেবে 'ফিকহ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

সঠিক উপলব্ধি শ্রেষ্ঠ নিয়ামত

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন–

> "উপলব্ধির বিশুদ্ধতা ও ইচ্ছার সৌন্দর্য বান্দার জন্য আল্লাহপ্রদত্ত সর্বোচ্চ নিয়ামত। বান্দা রবের পক্ষ থেকে ইসলামের হিদায়াত লাভের পর সবচেয়ে মর্যাদাবান নিয়ামত হিসেবে এ দুটিই পেতে পারে। এ দুটি নিয়ামতের চেয়ে চমৎকার আর কিছুই হতে পারে না। বলতে গেলে এ দুটিই ইসলামের গোড়ালি। ইসলাম এ দুটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বান্দা এ দুটির মাধ্যমে পথভ্রষ্টতা ও অশুভ চিন্তা থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। বিবেকবোধ নষ্ট হয়ে যাওয়া বিভ্রান্তদের পথ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে। নিজের স্থান করে নিতে পারে নিয়ামতপ্রাপ্ত সুবুদ্ধিসম্পন্ন ও সুচিন্তাধারীদের মাঝে। তারা হতে পারে সিরাতে মুসতাকিমের পথিক– যে পথের পথিক হওয়ার জন্য প্রত্যেক সালাতে দুআ করতে আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
>
> উপলব্ধির বিশুদ্ধতা একটি নূর। আল্লাহ তায়ালা এটি বান্দার হৃদয়ে ঢেলে দেন। উপলব্ধির বিশুদ্ধতার মাধ্যমে সে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ, হক ও বাতিল, সত্যনিষ্ঠা ও ভ্রষ্টতা এবং আলো ও আঁধারের মাঝে পার্থক্য করতে পারে।
>
> ইচ্ছার সৌন্দর্য বান্দাকে সত্য আঁকড়ে ধরতে সাহায্য করে। গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করতে শেখায়। তার ভেতর থেকে প্রবৃত্তির অনুসরণ, দুনিয়ার প্রাধান্য, সৃষ্টির প্রশংসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও তাকাওয়াহীনতা দূর করে দেয়।"[১৪]

ইমাম বুখারি রহ. আলী রা.-এর সূত্রে এই বর্ণনাটি সংকলন করেছেন–

> "আলী রা.-কে প্রশ্ন করা হলো– 'রাসূলুল্লাহ সা. কি আপনাদের বিশেষ কিছু দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন?' তিনি জবাব দিলেন– 'না। আল্লাহর বান্দাদের কুরআনের যে সঠিক বুঝ দেওয়া হয়, শুধু তা এবং এই সহিফাখানা।' এ কথা বলে তিনি তাঁর সাথে থাকা বেশ কিছু হুকুমসমৃদ্ধ একটি পুস্তিকা বের করলেন।"

---

১৪. *ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন*, ইবনুল কাইয়িম, ৮৭/১; তাহকিক : মুহাম্মাদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ।

www.bjilibrary.com

সুতরাং আল্লাহ ও রাসূলের কথার সঠিক উপলব্ধি সর্বোত্তম নিয়ামত। আর সঠিক উপলব্ধির অনুপস্থিতি মানুষকে বড়ো ধরনের বিপদে ফেলে দিতে পারে। তার চেয়েও বড়ো বিপদ হলো– বক্র উপলব্ধি। বক্র উপলব্ধি রুদ্ধ করে দেয় সুস্থ চিন্তার পথ।

উসূলগুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ

কিছু মানুষের মনে আরেকটি প্রশ্ন জাগতে পারে– এই উসূলগুলোকে আমরা এত গুরুত্ব দিচ্ছি কেন? এটা তো আল্লাহ পাকের কালামও নয়, আবার রাসূল সা.-এর হাদিসও নয়, তাহলে একে এত গুরুত্ব দেওয়ার কারণ কী? আমরা এই উসূলসমূহের এত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনাই-বা করছি কেন?

অন্যকথায়– আমরা কি আমাদের ইমামকে 'আহলুল ইসমাহ' মনে করছি? হাসান আল বান্না কি মাসুম (নিষ্পাপ)?

কখনোই না। ইমাম হাসান আল বান্না বা তাঁর কোনো সাথি কখনোই এমন কিছু দাবি করেননি। তারা ইমাম বান্নাকে ভালোবাসেন এবং পছন্দ করেন– এতটুকুই। ইমাম হাসান আল বান্নার মতো ব্যক্তির ব্যাপারে এ রকম কথা বলার তো কোনো সুযোগই নেই। কেননা, তিনি নিজেই তাঁর বিশ মূলনীতির ষষ্ঠ নীতিতে বলেছেন–

وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم.

"আল মাসুম মুহাম্মাদ সা. ছাড়া অন্য সবার কথা গ্রহণও করা যাবে, আবার বর্জনও করা যাবে।"

তাহলে ইমাম বান্নার কথাকে এত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কেন? কেন তাঁর লিখিত বাক্যগুলোর ব্যাখ্যা করা হচ্ছে? আর যারা বলছেন– এটা কি কুরআন বা হাদিসের মতো কিছু যে, ব্যাখ্যা করতে হবে? তাদের কথারই-বা জবাব কী?

যারা এ ধরনের কথাবার্তা বলেন, তাদের দ্বীনি, তুরাসি[১৫] ও জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়ের জানাশোনায় যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। কারণ, শুধু কুরআন-হাদিসেরই ব্যাখ্যা হয় এমন নয়; বরং অসংখ্য সাধারণ মানুষের (নিষ্পাপ নয় এমন) রচিত বইয়েরও ব্যাখ্যা হয়েছে। সেই ব্যাখ্যার ওপর আবার হাশিয়াও

১৫. আমাদের পূর্বসুরিদের লিখিত ইসলামি জ্ঞানভান্ডার– যা আমরা ইলমি উত্তরাধিকার হিসেবে আমাদের পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে পেয়েছি। –অনুবাদক

www.bjilibrary.com

(প্রান্তটীকা) লেখা হয়েছে। হাশিয়াকে আবার বিভিন্ন গবেষকরা মূল্যায়ন করেছেন এবং সেই মূল্যায়নের ওপর অভিমত দিয়েছেন। এটি দ্বীনি ও সাধারণ সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রেই ঘটেছে এবং প্রতিনিয়ত ঘটছে। উদাহরণত বিভিন্ন বিষয়ের কিছু গ্রন্থাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন–

ইলমুল আকিদা : এ অঙ্গনে আমরা ইমাম আবু হানিফার আল ফিকহুল আকবার, আল আকিদাতুত তাহাবিয়্যাহ, আল আকিদাতুল ওসাতিয়্যাহ, আস সানুসিয়্যাহ, আল আকায়িদুন নাসাফিয়্যাহ, আল জাওহারাহ ইত্যাদি গ্রন্থগুলোর অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ দেখতে পাই।

ফিকহ : হানাফি মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতন কানযুদ দাকায়িক, আল হিদায়াহ; মালিকি মাযহাবের আর রিসালাহ, মুখতাসারু খলিল; শাফিয়ি মাযহাবের আল মিনহাজ, মাতানু আবি শুজা এবং হাম্বলি মাযহাবে আল ইকনা, আল মুনতাহা, যাদুল মুসতাকনি ইত্যাদি। এ সবগুলোর ছোটো-বড়ো বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে।

উসুলে ফিকহ : এ শাস্ত্রে ইমামুল হারামাইনের ওরাকাত, বাইযাভির মিনহাজ, মুসাল্লামুস সুবুত, মুখতাসারু ইবনিল হাজিব, সাদরুশ শারিয়াহর তাওদিহ ইত্যাদি গ্রন্থ দেখতে পাই। এ সব গ্রন্থের এক বা একাধিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে।

তাসাউফ : এক্ষেত্রে হিকামু ইবনে আতা এবং তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের কথা বলা যায়। আরও বলা যায় আল্লামা যুবাইদির করা ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন-এর ব্যাখ্যার কথাও।

উলুমুল হাদিস : এ বিষয়ে মুকাদ্দামাতু ইবনে সলাহ এবং এ কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ তাকরিবুন নববি কিংবা নাখবাতু ইবনে হাজার-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে।

আরবি ব্যাকরণশাস্ত্র : এ অঙ্গনে নাহু, ছরফ, বালাগাতের বহুসংখ্যক মতন, ব্যাখ্যা ও হাশিয়া পাওয়া যায়। এগুলো আরবি ভাষার সকল শিক্ষার্থী ও পাঠকের কাছে প্রসিদ্ধ।

সুতরাং ইমাম হাসান আল বান্নার মূলনীতিগুলোর ব্যাখ্যা করা অভিনব ও নতুন কোনো বিষয় নয়। তিনি ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের চিন্তা ও মননের ঐক্যের ভিত্তিস্বরূপ কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। ইমাম আল বান্না সচেতনভাবেই মূলনীতিগুলো সংক্ষিপ্ত রাখতে চেয়েছেন, যেন সেগুলো আয়ত্ত করতে এবং প্রয়োজনে মুখস্থ করতে সহজ হয়।

www.bjilibrary.com

এটি ফিকহ কিংবা অন্যান্য ইসলামি জ্ঞানের মতনগুলোর মতোই একটি 'মতন'। আর মতন সর্বদা ব্যাখ্যার দাবি রাখে, উদ্দেশ্য স্পষ্ট হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে, অনুচ্চারিত বিষয়গুলোর পূর্ণতা দানের প্রত্যাশা করে এবং মতনে উল্লেখিত আহকাম ও তত্ত্বগুলোর দলিল দাবি করে।

উসুলগুলো কাদের উদ্দেশে লিখিত

তৃতীয় একটি প্রশ্ন আসে। ইমাম হাসান আল বান্না কাদের উদ্দেশে এই উসুলগুলো লিখেছেন? এখানে কোন মানুষগুলো তাঁর লক্ষ্য? এর উত্তরে বলা যায়, এই উসুলগুলো দুই ধরনের মানুষের উদ্দেশে লেখা হয়েছে। যথা–

এক. ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কর্মী ও জনশক্তিদের জন্য। উল্লেখ্য, ইখওয়ান একটি গণমানুষের সংগঠন। এ সংগঠন মানুষের চিন্তাধারা, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিকের সংস্কার চায়। ইখওয়ানের আঙিনায় নানা চিন্তাধারা ও রঙের মানুষ শামিল হয়েছে। তাদের কেউ সালাফি, কেউ সুফি, কেউ মাযহাবের অনুসারী, আবার কেউ নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের অনুসারী নন। কেউ প্রাচীনপন্থি চিন্তাধারার, আবার কেউ সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তন ও সংস্কারে বিশ্বাসী। কেউ ইসলামি ঐতিহ্যের চিরায়ত সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত, কেউ আধুনিক নাগরিক জীবনধারায় অভ্যস্ত।

নানামুখী চিন্তা-চেতনার লোকদের মাঝে সমন্বয় সাধনের জন্য একটা সাধারণ মূলনীতি থাকা দরকার, যে মূলনীতিকে কেন্দ্র করে চিন্তার ঐক্য তৈরি হবে, মতপার্থক্য দূর হবে এবং মৌলিক ইস্যুগুলোতে একাত্মতা পোষণ করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, শাখা-প্রশাখাগত মাসআলার ক্ষেত্রে ইখতিলাফ ছেড়ে বেরিয়ে আসা কিন্তু সম্ভব নয়। তবে এই ইখতিলাফ থাকা সত্ত্বেও একাত্মতা এবং একই লক্ষ্যে কাজ করা সম্ভব।

দুই. ইমাম হাসান আল বান্না যখন উসুলগুলো লিখছিলেন, আজকের দিনের মতো তখনও ইসলামি সংগঠনগুলোর মাঝে ছিল অনেক মতপার্থক্য। তৎকালীন পরিস্থিতি আজকের সময়ের সাথে বহুলাংশে মিলে যায়। যেমন, জনৈক কবি বলেছেন– 'রাত্রি কেটে গেছে, কিন্তু তার ভয়াবহতা থেকে গেছে।' কোনো এক লেখক বলেছিলেন– 'ইতিহাস বারবার পুনরাবৃত্ত হয়।' যদিও এই কথার যথার্থতার ব্যাপারে মতপার্তক্য রয়েছে, কিন্তু একটু নজর বোলালেই দেখা যায়, বড়ো বড়ো বহু ঘটনা বা পরিস্থিতি মানবজাতির সামনে বারংবার একইভাবে ধরা দিয়েছে।

www.bjilibrary.com

এই উসুলগুলো লেখার সময় ইমাম বান্নার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বিবদমান ইসলামি সংগঠনগুলোর ওপর। তারা হরহামেশা দোষারোপ ও আক্রমণাত্মক কর্মে লিপ্ত হতো। একে অন্যকে ফাসিক, এমনকি কাফির ঘোষণার মতো জঘন্য কাজ করতেও দ্বিধা করত না। ইমাম বান্না এ সমস্যাগুলো নিজ চোখে দেখছিলেন। এগুলোর প্রভাবও তাকে স্পর্শ করেছিল।

ইমাম হাসান আল বান্নার দাওয়াতি কার্যক্রমের শুরুতে ইসমাইলিয়া শহরে প্রায়শ সালাফি বা সুন্নিরা বিতর্ক সভার আয়োজন করত। সেখানে হরহামেশা দোষারোপের চর্চা হতো। অপরপক্ষে সুফিবাদীরা তাদের তরিকা, শাইখ ও অনুসারীদের সমন্বয়ে আরেকটি সভার আয়োজন করত। স্বভাবতই তারা একই কায়দায় প্রথম দুই পক্ষের বিরোধিতা করত। তাদের মাঝে এমন বিতর্কযুদ্ধ চলছিল– যা শেষ হওয়ার নয়। সেখানে আরও কিছু বক্তা ছিলেন, যারা কোনো দলের নন; বিশেষ কোনো দলকে তারা পছন্দ করতেন না, ফলে তাদেরও কোনো পক্ষ পছন্দ করত না।

ইমাম হাসান আল বান্না ইসমাইলিয়া শহরে অবস্থানকালে এ সংকটগুলো দেখেছিলেন। কিছুদিন পর তিনি কায়রোতে চলে আসেন। তিনি দেখতে পান, কায়রোর ধর্মীয় মহলগুলোর মাঝে এ জাতীয় বিতর্কের পরিসর আরও বৃহৎ।

তখন মহান এ ব্যক্তির ধ্যানজ্ঞান উম্মাহর বিভক্তি মীমাংসা এবং তাদের ঐক্যের চিন্তায় মগ্ন ছিল। তখন বিভক্তি এত বেশি ছিল যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মুসলিমরা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। বিশ্বাসের বন্ধনে গড়া ঐক্যের শেষ দুর্গটিরও পতন হলো ১৯২৪ সালে– খিলাফতের পতন। ইসলামি ঐক্য ও মুসলিম জাতীয়তার বদলে প্রকাশ পাচ্ছিল গোষ্ঠীয় জাতীয়তাবাদ। যেকোনো মূল্যে ইসলামি শক্তিগুলোর ভেতর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা জরুরি হয়ে পড়েছিল দাঈ ও ইসলামের কর্মীদের মাঝেও। তাদের মধ্যকার দ্বীনি ও চিন্তাগত মতপার্থক্যকে একটি পরিসরে সীমিত করতে কিছু মূলনীতি ও উপলব্ধির গণ্ডিতে আবদ্ধ করাও অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ল। এমন কিছু মূলনীতির প্রয়োজন দেখা দিলো, যেগুলো বিভক্তির দিকে না নিয়ে একত্রিত করবে, দূরে ঠেলে না দিয়ে কাছে টানবে। তা ছাড়া মিশরীয় মুসলিম সংগঠনগুলো যদি কখনও একত্রিত হয় বা কোনো ঐক্যপ্রচেষ্টা চালায়, তখন তাদের একটি নীতিমালার প্রয়োজন পড়বে। এটিও ছিল ইমাম বান্নার এই নীতিমালা প্রণয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য। এটি হবে একটি নমুনাস্বরূপ– যাকে কেন্দ্র করে ইসলামি দল ও সংগঠনগুলো কাছাকাছি আসতে পারে।

www.bjilibrary.com

বিশ মূলনীতির কিছু বৈশিষ্ট্য

এখন আমরা উসুলগুলোর বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে দৃষ্টিপাত করব।

প্রথমত : প্রাচীন ও আধুনিক দ্বীনি শিক্ষাধারায় মতপার্থক্য রয়েছে– এমন বিষয়গুলোর ওপর এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন– আকিদায় সালাফ ও খালাফের মতপার্থক্য, সালাফি বনাম সুফিদের মতবিরোধ এবং মাযহাব অনুসারীদের সাথে লা-মাযহাবিদের ইখতিলাফ।

দ্বিতীয়ত : এখানে হিকমত ও ন্যায়নিষ্ঠার সাথে শব্দচয়ন করা হয়েছে, যাতে সকল শিক্ষাধারার প্রজ্ঞাবান লোকদের একাত্মতা সম্ভব হয়। অর্থাৎ, উপলব্ধি, একনিষ্ঠতা ও নমনীয়তার জরুরি প্রয়োজন যেন এর মাধ্যমে পূরণ হয়।

তৃতীয়ত : ইমাম বান্না এই উসুলগুলোকে সংক্ষিপ্ত ও সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেছেন এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এড়িয়ে গেছেন। কারণ, এখানে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নতুন কিছু বিতর্কের পথ খুলে দেবে– যা হবে তাঁর উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।

চতুর্থত : এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও পশ্চিমা জীবনধারায় অভ্যস্তদের ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। যদি ইমাম তাদের বিষয়গুলো গুরুত্ব দিতেন বা উদ্দেশ করতেন, তাহলে আরেকটি উসুল বৃদ্ধি করতে হতো।

পশ্চিমা জীবনধারায় অভ্যস্ত মুসলিমদের উদ্দেশে ইসলামের আদর্শ ও নীতি বর্ণনা করে রচিত الإسلام والعلمانية وجها لوجه। (ইসলাম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা) গ্রন্থে আমি এ ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। বইটির একটি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে তাদের জন্য ১৮টি বিষয়ে মোটামুটি বিস্তৃত আলোচনা করেছি।[১৬] আমার ধারণা ইমাম হাসান আল বান্না যদি আমার যুগে ও পরিস্থিতিতে থাকতেন, তিনিও একই কাজ করতেন। কেননা, প্রত্যেক স্থান-কাল-পাত্রের একটা স্বতন্ত্র দাবি রয়েছে।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, সেটি হলো– ইমাম হাসান আল বান্নার চিন্তাধারা ঐক্য ও সমঝোতার বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বরং এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে।

---

১৬. দেখুন, আমার রচিত গ্রন্থ *আল ইসলাম ওয়াল আলমানিয়্যাহ ওয়াজহান লি ওয়াজহিন*, পৃষ্ঠা ৩৬-৪৭, প্রকাশনা : দারুস সাহওয়া, কায়রো।

www.bjilibrary.com

ঐক্য ও সমঝোতার নিদর্শন

স্পষ্টতই এই নীতিমালা ঐক্য ও সমঝোতার নির্দশন। এই নীতিমালাগুলোর ব্যাখ্যা শুরু করার পর কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছিল সত্তরের দশকের শুরুতে উসতায উমর তিলমিসানির সম্পাদিত 'দাওয়াহ' সাময়িকীতে। তখন আমি এর নাম দিই– نحو وحدة فكرية إسلامية (মুসলিম মননে চিন্তার ঐক্য)। আল্লাহর অশেষ রহমত, শাইখ মুহাম্মাদ আল গাযালি এই নামটা পছন্দ করেছিলেন। উসতায গাযালি তাঁর লিখিত উসুলুল ইশরিনের ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম এর সাথে মিলিয়ে রেখেছেন– دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين (মুসলিম মননে ঐক্যের নীতিমালা)।

ইমাম হাসান আল বান্না সর্বদা গঠনমূলক ও ঐক্যের প্রয়োজনে কাজ করতেন; তাকে কখনোই হঠকারিতা বা বিচ্ছিন্নতার চিন্তা স্পর্শ করতে পারেনি। তবে কিছু কিছু বিষয় তিনি স্পষ্ট করে যাননি; বরং বিবদমান পক্ষগুলোকে তাদের মতের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, তাদের নিজেদের মতো করে দলিলভিত্তিক আমল করার সুযোগ দিয়েছেন। যেমন– নবি-রাসূল ও সালিহিনের ওসিলা করে দুআ করার প্রসঙ্গ ইত্যাদি। এ বিষয়ক আলোচনার শুরুতে ইমাম হাসান আল বান্না জোর দিয়ে বলেছেন, একমাত্র আল্লাহ তায়ালা দুআ ও ওসিলার হকদার। অতঃপর মতপার্থক্যের জায়গায় এসে বলেছেন, নবি সা. এবং অন্য কারও ওসিলা করে দুআ করার প্রসঙ্গটা ব্যবহারিক ও শাখাপর্যায়ের মাসআলা। এটি ইলমে ফিকহের বিষয়; আকিদাসংশ্লিষ্ট বিষয় নয়। আকিদায় তাওহিদ নিয়ে আলোচনা করা হয়; দুআর ধরনসংক্রান্ত মতভেদ আকিদার গণ্ডিতে পড়ে না। তাই দুআর ধরণ সংক্রান্ত আলোচনা আমল তথা ফিকহের অঙ্গনে হবে; আকিদার অঙ্গনে নয়।

মুসলিম সমাজের কেউ কেউ কিছু বিষয়কে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ বিষয়ে তারা ইমাম বান্নাকে দোষারোপও করে! তাদের মতে, উসতায হাসান আল বান্না একটি অকাট্য (কাতয়ি) বিষয়কে অবহেলা করেছেন। আসলে তারা এ বিষয়ে ইমামের দৃষ্টিভঙ্গিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। তাদের চিন্তা ইমামের ঐক্যমুখী চিন্তার মতো নয়। তাদের লক্ষ্য ইমামের লক্ষ্যের সাথে একাত্ম নয়। ইমাম হাসান আল বান্না সমগ্র উম্মাহর জন্য কাজ করছেন। মতানৈক্যকে তার জায়গায় রেখে উম্মাহকে এক কাতারে নিয়ে আসতে চেয়েছেন।

www.bjilibrary.com

ইমাম বান্না জানতেন, আমাদের প্রতিপক্ষ ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু ও লুকিয়ে থাকা মুনাফিকরা। তাই তিনি শত্রুর সামনে সিসাঢালা প্রাচীর দাঁড় করানোর প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতবিরোধগুলো সতর্কতার সাথে এড়িয়ে চলতেন। তার মানে ইমাম বান্না ইসলামের মৌলিক কোনো বিষয়ে ছাড় দিয়েছেন– এমন নয়। এ ধরনের ছাড় কখনও কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন– তিনি কাশফ, ইলহাম, স্বপ্ন ইত্যাদির দাবিদার এবং এগুলোকে শরয়ি হুকুম ও চারিত্রিক উন্নতির উৎস বা সহায়ক হওয়ার বিরোধিতা করেছেন। তাবিজ, রুকইয়া, ভবিষ্যৎ গণনা, কবর যিয়ারত, ওয়াসিলা ও কারামত নিয়ে বাড়াবাড়ি-সংক্রান্ত শিরকের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তেমনি তিনি বিদআত এবং আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোনো কিছুকে শরিয়তে অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধিতা করেছেন। আর আহ্বান করেছেন কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে, ইসলামের আহকাম জানতে এবং এর দিকে ফিরে আসতে।

মতৈক্য ও একাত্মতার দিকে ইমাম বান্নার অবস্থান সব সময়ই ছিল জোরালো। ইজতিহাদ কিংবা দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতাকে উপড়ে না ফেলে তিনি সবাইকে নিজ নিজ মানহাজের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। এটি দোষের কিছু নয়। গভীর জ্ঞানের আলিমরা এ কাজটিই করতেন। তাদের প্রশ্ন করা হলে বেশিরভাগ সময় বলতেন– 'বিষয়টা আমি জানি না'। তাদের সামনে পূর্ববর্তী আলিমদের মতপার্থক্যসমূহ উপস্থাপন করা হতো। তারা কোনো মতকেই প্রাধান্য দিতেন না। উদাহরণস্বরূপ, ইমাম শাফিয়ির কথা বলা যায়। তিনি অসংখ্য মাসআলায় কোনো মতকেই প্রাধান্য দেননি। ইমাম রাযি 'আল-মাহসুল' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন– "এটি ইলম ও দ্বীনে ইমাম শাফিয়ির পরিপূর্ণতার নির্দশন।"

জ্ঞানের রাজ্যে যার নজর যত গভীর, চিন্তা যত সূক্ষ্ম, মৌলিক ও শাখা-প্রশাখার জ্ঞানে যার ব্যাপ্তি যত বেশি, দলিলের শর্ত পূরণে যে যত বেশি পর্যবেক্ষণ করেন– তার দ্বিধাদ্বন্দ্ব তত বেশি। কেননা, অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়– এমন ক্ষেত্রগুলোতে কোনো একটি মতকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরা এবং তাতে নড়চড় না করা একদেশদর্শিতা, বিচক্ষণতার ঘাটতি এবং দুর্বল মেধার নমুনা। এ ধরনের লোক শরিয়ার দলিল পর্যবেক্ষণের সময় শর্ত ও প্রতিবন্ধকতা বিবেচনা করতে পারে না। এ ব্যাপারে দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য–

এক. যদি কোনো আলিম, মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়ে কোনো মতকে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে না পারেন, তবে জ্ঞান না থাকার কারণে লজ্জা পাওয়া এবং তাড়াহুড়ো বা গোঁজামিলের আশ্রয় নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই;

www.bjilibrary.com

বরং অকপটে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে নেওয়াই কল্যাণকর। মজবুত ঈমানের সাথে এ ধরনের অনুশীলন খুবই সংগতিপূর্ণ ও স্বাভাবিক। আমাদের সময়ের আলিমরা এমন চরিত্র গ্রহণ করতে সংকোবোধ করছেন; অথচ উমর ফারুক রা. নিজেই বহু মাসআলা সম্পর্কে নিজের জ্ঞান না থাকার কথা স্পষ্ট করে বলেছেন।[১৭] দুর্ভাগ্য! মুসলিমরা এই মহৎ ও শ্রেষ্ঠ অনুশীলন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এমনকি তারা এটাকে লজ্জাজনক মনে করছে।

দুই. সাইয়িদুনা উমর ফারুক রা. শুরুতেই বলেননি যে, 'বিষয়টি আমি জানি না'; বরং তিনি দুটি দৃষ্টিভঙ্গিসহ মাসআলাটি পেয়েছেন। তারপর তাকে দলিলের সাথে ঘটনার সম্পৃক্ততার দিকগুলো অবহিত করা হলো, কিন্তু তিনি একটি দলিলও প্রাধান্য দিতে পারেননি। উমর রা. মাসআলাকে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন– যাতে তার পরের লোকেরা এই বিষয়ে চিন্তা করার উদ্দীপনা পায় এবং অন্য মুজতাহিদগণ এই বিষয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য মতের তালাশে উৎসাহ অনুভব করে। আর এটাই সুসংহত দ্বীন, ধীরস্থির বিবেকবোধ ও জ্ঞানের পূর্ণতার সাথে মানানসই। যিনি ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যকে মেনে নেন, তিনি স্বীকার করবেন যে– একটি দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়ার মানে হচ্ছে, ইলম ও দ্বীনের অন্য সকল মুজতাহিদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রাধান্য দেওয়া।[১৮]

ইমাম হাসান আল বান্না অর্ধশতাব্দী পূর্বে ঐক্যবদ্ধতা এবং সবার উপযোগী মানহাজের যে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন, আমরা সেই প্রয়োজনীয়তা এখনও তীব্রভাবে উপলব্ধি করছি।

মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং তার বাইরের মুসলিমদের বিভিন্ন এলাকা ও সমাজের যেখানেই সফর করেছি, পূর্ব-পশ্চিমের যে ভূমিতেই কোনো সম্মেলন, সেমিনার বা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছি, সবখানে একটি কমন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি।

---

১৭. উমর রা. থেকে বিভিন্ন বিষয়ে এই ধরনের কথা বর্ণিত হয়েছে। যার কিছু দাদা ও ভাইদের মিরাস এবং কালালার মিরাস সংক্রান্ত, কিছু সুদের অধ্যায়ে। ইমাম বুখারি, মুসলিম ও অন্যান্য অনেকে তা বর্ণনা করেছেন। আরও দেখুন : *সুনানুল বায়হাকি*, ২৪৫/৬, *ফাতহুল কারিব*, ৩৯/১

১৮. *আল মাহসুল ফি ইলমি উসুলিল ফিকহ*, ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি, তাহকিক : তহা জাবির আল আলওয়ানি, ৫২৭,৫২৮/২/২

www.bjilibrary.com

প্রশ্নটি বারবার বিভিন্নভাবে, কখনও আকুতির সুরে আবার কখনও তীর্যকভাবে আমার কাছে এসেছে–

> "আমরা সবাই ইসলামের দিকে আহ্বান করি, কিন্তু বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগঠনে বিভক্ত হয়ে! কেন আমরা একই সংগঠনে একই আঙিনায় একত্রিত হতে পারছি না?"

এ প্রসঙ্গে আরও অনেক প্রশ্ন এসেছে, যা ঘুরেফিরে এ রকম– ইসলামি জামায়াতগুলোর মাঝে বিরোধ লেগে আছে কেন? কেন সব জামায়াত বিচ্ছিন্ন না থেকে একটি বৈশ্বিক আন্দোলনে একত্রিত হতে পারছে না? ঐক্যবদ্ধতা ছোটোসংখ্যক মানুষকে শক্তিশালী করে, আর বিভেদ বড়ো সংখ্যাকেও দুর্বল করে দেয়, তাহলে আমাদের মাঝে এত মতবিরোধ কেন? আমরা সবাই কি ইসলামের বিজয় এবং ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছি না? আমাদের সকলের যাত্রা ও গন্তব্য কি ইসলাম নয়? কেন আমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত? কেন আমরা একত্রিত হচ্ছি না? কেন আমরা ঐক্যবদ্ধতার বদলে মতবিরোধ করেই চলেছি?

আমাদের একনিষ্ঠ দাঈগণ একটি একক বৈশ্বিক ইসলামি আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উদগ্রীব। যে আন্দোলনে বিশ্বের সকল জামায়াত সংযুক্ত হবে, যে আন্দোলন উম্মাহর সকল শক্তিকে ধারণ করবে, তবেই তা শত্রুদের সম্মিলিত শক্তির ষড়যন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম হবে। উল্লেখ্য, ইহুদি, নাসারা, সমাজতান্ত্রিক ও পৌত্তলিকরা নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করলেও ইসলামের বিরুদ্ধে সবসময় একজোট থাকে।

পাঠকের কাছে এটা স্পষ্ট যে, বহুল আকাঙ্ক্ষিত এই ঐক্যের পথে একগুচ্ছ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

ঐক্যের প্রথম দাবি হচ্ছে– লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তার অগ্রাধিকার নিরূপণে মতৈক্যে আসা। তারপর অভীষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও মানহাজের প্রশ্নে একমত হওয়া। অতঃপর নেতৃত্ব, নেতৃত্বের একনিষ্ঠতা, যথার্থতা ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে তাদের সক্ষমতার ওপর আস্থার প্রশ্নে এক বিন্দুতে আসা। আর এসবকিছু শুধু একটি সংগঠনের ভেতরেই বাস্তবায়নযোগ্য। এ কারণেই আমরা মনে করি, সকল আন্দোলন ও সংগঠনকে একই প্ল্যাটফর্মে এনে একটি আন্দোলন বা জামায়াত গড়ে তোলার স্বপ্ন খুবই সুন্দর বটে, কিন্তু বাস্তবায়নের প্রশ্নে খুবই কঠিন ও দূরবর্তী চিন্তা।

www.bjilibrary.com

আমি মনে করি এবং আমার বিভিন্ন বইয়েও উল্লেখ করেছি যে, সকল ইসলামি সংগঠন একত্রিত হয়ে একই ছাদের নিচে চলে আসা আবশ্যিক নয়। বরং এতটুকুই যথেষ্ট যে, ইসলামি দলগুলো কাছাকাছি অবস্থান করবে এবং পরস্পরের মাঝে বিরোধ ও উপেক্ষা-অবজ্ঞার উপকরণগুলো দূর করে নেবে। সেইসাথে দলগুলোর মাঝে সমন্বয়, বোঝাপড়া ও সহযোগিতার জন্য একটি পক্ষ কাজ করবে– যাতে তারা একে অপরের পরিপূরক হতে পারে, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বড়ো বড়ো ইস্যুগুলোতে সিসাঢালা প্রাচীরের মতো একই ফ্রন্টে অবস্থান নিতে পারে। এভাবে ইসলামি দলগুলোর মতপার্থক্য শত বাগানে শত ফুল ফোটাবে; পরস্পরবিরোধী কোনো সংঘাত ও ঝগড়া নিয়ে হাজির হবে না।

পূর্বেই বলেছি– এই নৈকট্য, সমঝোতা ও সহযোগিতার জন্য জরুরি হচ্ছে, কমন উপলব্ধির একটি ন্যূনতম গণ্ডি নির্ধারণ করা। আর সেই গণ্ডিকে কেন্দ্র করে জামায়াতগুলো একত্রিত হবে, পরস্পর দূরে সরিয়ে দিতে অভ্যন্তরা কাছাকাছি আসবে এবং কাছাকাছি চিন্তার লোকেরা তাদের বন্ধন আরও মজবুত করবে। আর ইমাম হাসান আল বান্না রচিত এই মূলনীতিগুলো বৃহত্তর পরিসরে সেই কাজটিই আঞ্জাম দেবে।

*****

www.bjilibrary.com

প্রথম মূলনীতি

الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء، وهو مادة وثروة أو كسب وغنى، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء.

"ইসলাম এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা– যা মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব, যেমনিভাবে ইসলাম সত্য আকিদা ও বিশুদ্ধ আমল, ঠিক তেমনিভাবে ইসলাম হচ্ছে– রাষ্ট্র ও দেশ তথা শাসনব্যবস্থা ও জাতি, আখলাক ও শক্তি (Power) তথা রহমত ও আদালত, সংস্কৃতি ও আইন তথা জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিচারব্যবস্থা, পুঁজি ও সম্পদ তথা উপার্জন ও প্রাচুর্য, জিহাদ ও দাওয়াত তথা সেনাবাহিনী ও আদর্শ। ইসলামে এই উভয় দিকই সমান গুরুত্বের দাবিদার।"

www.bjilibrary.com

প্রথম মূলনীতি

ইসলাম সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা

মুসলিম জনসাধারণ এবং বিশেষ করে ইসলামি দাওয়াহর কর্মীদের জন্য ইসলামের মূলতত্ত্বের যথার্থ অনুধাবন জরুরি। বর্তমান সময়ে তা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর খেয়াল রাখতে হবে, ইসলাম অনুধাবনের এই অভিযাত্রায় ইসলাম যেন বিকৃত বা পরিবর্তিত কোনো রূপে মানুষের সামনে উপস্থাপিত না হয়। মানুষ যেন ইসলামকে তার প্রকৃত সত্তার বিপরীত বা মিশ্রিত কিছু মনে না করে। আর ইসলামের কোনো অংশকে যেন ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া না হয়। অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ ইসলাম হিসেবে যা পালন করছে, তা আসলে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম নয়; বরং ইসলামের একটি অংশবিশেষ।

আমরা ইমাম হাসান আল বান্নার বিশ মূলনীতি ব্যাখ্যা করছি। ইমাম বান্না তাঁর দাওয়াতি আন্দোলনের জনশক্তিদের চিন্তাগত ঐক্যের প্রয়োজনে এই নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। এই নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইমাম বান্না অবলম্বন করেছেন মধ্যপন্থা ও ভারসাম্যের নীতি। কট্টরপন্থিদের কঠোরতা কিংবা উদারপন্থিদের অতি উদার মনোভাব বা শিথিলতা তাঁর চিন্তাকে প্রভাবিত করতে পারেনি।

এ বিশ মূলনীতি প্রণয়নে ইমাম হাসান আল বান্না হিকমত ও আমানতদারিতার সাথে শব্দচয়ন করেছেন, যেন বিবদমান ইসলামি অঙ্গনগুলোর মাঝে এগুলো ঐক্যের ভিত্তি হতে পারে। যদিও মৌলিক ও শাখাপর্যায়ের কিছু বিষয়ের বোঝাপড়ায় ইসলামি দলগুলোর মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। আর এ মতপার্থক্য প্রায়শ দলগুলোকে ঝগড়া, হানাহানি ও কটাক্ষের দিকে নিয়ে যায়। তারপরও ইসলামি দলগুলোর চিন্তাকে মৌলিক বিষয়াদিতে একই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করা সম্ভব।

www.bjilibrary.com

মতবিরোধ বিভিন্ন কারণে হতে পারে। যেমন– মীমাংসা প্রদানকারী কোনো মানদণ্ডের অনুপস্থিতি, ইলম ও হুকুমের উৎস নির্ধারণ না করা, কোনো কিছুকে তার যথাযথ অবস্থান অনুযায়ী মূল্যায়ন না করা, অপরপক্ষের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করা, দুই বা ততোধিক মতসম্পন্ন সমস্যায় গভীর ও সূক্ষ্ম মনোনিবেশ না করা– ইত্যাদি কারণে মতবিরোধ হতে পারে।

আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করেছি, মিশরের দ্বীনি প্ল্যাটফর্মগুলো একে অপরকে অপবাদ দিচ্ছিল। তারা কেবল নিজেদেরকেই হক এবং অন্য সবাইকে বাতিল বলে মনে করছিল। এমনকি কেউ কেউ সীমা ছাড়িয়ে অপরপক্ষকে 'কাফির' পর্যন্ত ঘোষণা দিচ্ছিল।

ইখওয়ান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে মিশরের দ্বীনি সংগঠনগুলোর অবস্থা

ইমাম হাসান আল বান্না যখন তাঁর দাওয়াতি মিশন শুরু করছিলেন, তৎকালীন মিশরের ইসলামি সংগঠনগুলোর সবারই একটা কমন সংকট ছিল। ইসলামি সংগঠনগুলো ঐশী বিধানের কোনো একটি দিকের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দিত এবং অন্য দিকগুলোকে অবহেলা করত; বরং আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে– গোনায়ও ধরত না। সম্ভবত, দলগুলো ইসলামে যে দিক নিয়ে কাজ করছে, যে দিকের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করছে কোনো একসময় তা অবহেলিত ছিল। তাই প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই দলগুলোর পূর্ণ মনোনিবেশ সেই বিষয়ে বা কাজে নিবদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে দলগুলো তাতেই আবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং তাদের কার্যক্রম প্রান্তিকতায় পর্যবসিত হয়েছে।

আনসারুস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়্যাহ : এই দলটি আকিদায় বেশি গুরুত্ব দিত। সেইসাথে তারা আকিদায় প্রবিষ্ট সকল বড়ো ও ছোটো শিরকের পরিশুদ্ধির জন্য কাজ করত। ওলিদের পবিত্র জ্ঞানকারী এবং মাজার তাওয়াফকারীদের বিরুদ্ধে আনসারুস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়্যাহ সংগ্রাম করত। জামইয়্যাহ শারইয়্যাহসহ যারা আল্লাহর গুণাবলিসংক্রান্ত আয়াত-হাদিসের ব্যাখ্যা করত, তাদের বিরুদ্ধে আনসারুস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়্যাহ ছিল আক্রমণাত্মক। আনসারুস সুন্নাহর সবচেয়ে বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সুফিবাদীরা। নতুন ধারার সুফি, প্রাচীনপন্থি সুফি, মধ্যপন্থি সুফি, নববি সুফি, আমলি সুফি– সবাই ছিল আনসারুস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়্যাহর ঘোরতর শত্রু।

আল জামইয়্যাতুশ শারইয়্যাহ : এই দলটি ইবাদত-বন্দেগির ওপর বেশি গুরুত্ব দিত; বিশেষ করে সালাতের জ্ঞানগত ও আমলগত দিকসমূহের ওপর।

www.bjilibrary.com

সুন্নাহমাফিক ইবাদত প্রতিপালন এবং ইবাদতের অঙ্গনে বিদআত প্রতিরোধে কাজ করত তারা। জামইয়্যাহ শারইয়্যাহ দলটি জায়গায় জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করত। কিন্তু তারা আযহারের অধিকাংশ আলিমের মতো আল্লাহর গুণবাচক আয়াত-হাদিসকে ব্যাখ্যা করত। এজন্য জামইয়্যাহ শারইয়্যাহ এবং আনসারুস সুন্নাহর মাঝে উত্তাপ বেড়েই চলছিল।

জামইয়্যাতুশ শুব্বানিল মুসলিমিন : এই দলটির কর্মকাণ্ডে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বেশি গুরুত্ব পেত। তারা সিম্পোজিয়াম, সেমিনার, অ্যাকাডেমিক কর্মশালা ইত্যাদির আয়োজন করত। খেলাধুলায়ও তাদের অংশগ্রহণ ছিল সমানতালে। কারণ, খেলাধুলায় যুব সমাজের স্বভাবজাত ঝোঁক রয়েছে।

শাবাবু সাইয়িদিনা মুহাম্মাদ : এই দলটি পোশাক-পরিচ্ছদ, নারী-পুরুষের মেলামেশা ইস্যু, বিশেষ করে মুসলিম নারীসংক্রান্ত বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে কাজ করত। তারা এটাকে নিজেদের প্রধান কর্ম বানিয়ে ফেলেছিল। শাবাবু সাইয়িদিনা মুহাম্মাদ দলটি গণহারে হালাল ও বৈধ ঘোষণার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। তারা পরিবার ও নারীসংক্রান্ত ব্যাপারে সবচেয়ে কঠিন মতটি গ্রহণ করত। নারী-পুরুষের সাক্ষাতের ব্যাপারে শাবাবু সাইয়িদিনা মুহাম্মাদ দলটি ছিল খুবই কঠোর। তারা মুখমণ্ডল ও হাত খোলা রাখার পক্ষে সকল মতের একাট্টা বিরোধিতা করত। শাবাবু সাইয়িদিনা মুহাম্মাদ দলটির সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা এই একটি ক্ষেত্রকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছিল।

সুফি তরিকাসমূহ : সুফিপন্থিদের মাঝে কিছু লোক ছিল একনিষ্ঠ ও সত্যপন্থি। আবার কিছু লোক ছিল, মূর্খ ও অন্ধ অনুসরণকারী। আর বাকিরা ছিল দাজ্জাল ও গাদ্দার চরিত্রের। তাদের উৎপাতে সঠিক ইসলামি চিন্তা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। সুফিবাদীদের পূর্ণ মনোনিবেশ ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক আধ্যাত্মিক ইবাদত চর্চায়। তাদের কিছু সমাজমুখী কার্যক্রম থাকলেও তা ছিল তরিকার গণ্ডির ভেতরে থেকে। সুফিবাদীদের অধিকাংশই ইবাদতে খামখেয়ালি, আকিদায় প্রান্তিক অবস্থান এবং চারিত্রিক ত্রুটির দোষে দুষ্ট ছিল।

এই ছিল তৎকালীন মিশরের দ্বীনি জামায়াতগুলোর অবস্থা। ইমাম হাসান আল বান্নার দাওয়াতি কার্যক্রমের প্রাক্কালে ইসলামি দলগুলো এ ধরনের এককেন্দ্রিক কাজকর্মে ব্যস্ত ছিল। অথচ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা; মুসলিমরা সবাই মিলে এক উম্মাহ। তখন ইসলামি শরিয়াহর ওপর মানবরচিত আইন প্রাধান্য বিস্তার করছিল, পশ্চিমা চিন্তা ইসলামি দর্শনকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল,

www.bjilibrary.com

পশ্চিমা রীতিনীতি ইসলামি জীবনাচরণকে গৌণ করে দিচ্ছিল, খ্রিষ্টীয় সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম উম্মাহ ও মুসলিম বিশ্বের ওপর জেঁকে বসেছিল, শরিয়াহকে উপেক্ষা করা হচ্ছিল, হুদুদকে (শরয়ি দণ্ডবিধি) অকার্যকর করা হচ্ছিল, উম্মাহ হয়ে গিয়েছিল খণ্ড-বিখণ্ড আর খিলাফত চূর্ণ-বিচূর্ণ এবং দ্বীনকে জীবনঘনিষ্ঠতা ও সামাজিক নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করা হয়েছিল। দুনিয়ায় যখন এসব ঘটনাবলি আবর্তিত হচ্ছিল, তখন এসব বিষয় নিয়ে ইসলামি সংগঠনগুলোর মাঝে তেমন কোনো উদ্বেগ দেখা যায়নি। আর এসব ঘটনাকেন্দ্রিক দলগুলোর উল্লেখযোগ্য কোনো কার্যক্রম ছিল না বললেই চলে। হ্যাঁ, খুবই সামান্য ও ইস্যুকেন্দ্রিক অল্প কিছু কাজকর্ম বিক্ষিপ্তভাবে হচ্ছিল। এই অল্পস্বল্প কাজের পেছনে সংগঠনগুলোর সামগ্রিক ভূমিকার চেয়ে সেখানে থাকা কতিপয় জিন্দাদিল ব্যক্তিরাই ভূমিকা রাখছিল। অর্থাৎ, সচেতন কিছু মানুষ সব জায়গাতেই ছিল।

ভালো নিয়ত ও প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা থাকার পরও এই দ্বীনি সংগঠনগুলোর অবস্থা হয়েছিল অন্ধের হাতি দেখার গল্পটার মতো। তারা একসাথেই হাতি স্পর্শ করেছিল। একেকজন একেক অংশ স্পর্শ করার কারণে হাতির ধারণাও একেকজনের কাছে একেক রকম মনে হয়েছে। তাদের যখন হাতির অবয়ব বর্ণনা করতে বলা হলো, তখন একজন বলল, এটা মসৃণ চিকন হাড়। কারণ, সে শুধু দাঁত স্পর্শ করেছে। দ্বিতীয়জন বলল, এটা বিশাল চওড়া শরীর। কেননা, সে শুধু পেট স্পর্শ করেছে। তৃতীয়জন বলল, হাতি হলো খাড়া খাম্বার মতো। যেহেতু সে শুধু পা স্পর্শ করেছিল। চতুর্থজন আরেক রকম বর্ণনা দিলো। কারণ, সে শুধু লেজ স্পর্শ করেছে। পঞ্চমজন শুঁড় স্পর্শ করেছে বলে পূর্ববর্তী চারজনের চেয়ে ভিন্ন বর্ণনা দিলো। তাদের প্রত্যেকে সত্য কথা বলেছে, কিন্তু কেউ-ই হাতির সামগ্রিক অবয়ব বর্ণনা করতে পারেনি। কারণ, তারা যেভাবে জেনেছে, ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করেছে। যদি তারা নিজ চোখে হাতি দেখতে পেত, তবে তাদের মত বদলে যেত এবং তাদের বর্ণনায় হাতির আকৃতিও হতো যথার্থ।

ইসলামি সংগঠনগুলোর অবস্থা দাঁড়িয়েছিল ঠিক এমনই। কেউ মনে করছিল, ইসলাম শুধু আকিদায়। অপরদল ইবাদতকেই ইসলাম মনে করছিল। তৃতীয় পক্ষের মত ছিল– বিনয় ও পবিত্রতা সবকিছুর আগে। চতুর্থদলের কাছে রুহ ও কলবের পবিত্রতাই সব। এগুলোর প্রত্যেকটিই ইসলামের প্রশ্নে সঠিক। কিন্তু এগুলো পূর্ণাঙ্গ ইসলাম নয়; এসবের প্রতিটিই ইসলামের একেকটি অংশ মাত্র।

www.bjilibrary.com

একটি সংগঠন ইসলামের কোনো একটি বিশেষ দিকে বেশি গুরুত্ব দিতেই পারে। এতে শরিয়ত বা বিবেকের কোনো বাধানিষেধ নেই। সেই সংগঠন ইসলামের একটি বিষয়কে তাদের কর্মের অঙ্গন করে নিতে পারে। নিজেদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাও তার পেছনে বিনিয়োগ করতে পারে। এক্ষেত্রে সেই সংগঠনের সাথে অন্যদের মতপার্থক্য হবে নিয়মতান্ত্রিক; পরস্পর বিপরীতমুখী মৌলিক মতপার্থক্য নয়।[১৯] সমস্যা হয় তখনই, যখন দলগুলো ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা অস্বীকার করে এবং তারা যে অংশে গুরুত্ব দেয়, শুধু সেটাকেই ইসলাম মনে করে। সেইসাথে অন্যান্য অঙ্গনে যারা কাজ করে, তাদের বিরোধিতা করে এবং বৃহত্তর পরিসরের কাজগুলোতে সহায়তার পরিবর্তে অসহযোগিতা করে।

রাজনৈতিক দলসমূহের অবস্থা

সেসময় মিশরে বেশ কিছু দল রাজনৈতিক অঙ্গনকে মুখর রাখত। এই দলগুলো ছিল সাধারণত ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদে প্রভাবিত। মিশরে ভূমিভিত্তিক জাতীয়তাবাদ গোত্রীয় জাতীয়তাবাদের পূর্বে উদ্ভাবিত হয়েছিল। এই রাজনৈতিক দলগুলোতে ব্যক্তিগত ও চারিত্রিকভাবে ধার্মিক লোকজনও ছিল, কিন্তু এগুলো কোনো বিশ্বাসভিত্তিক দল ছিল না।

এই রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশ নেতা ইউরোপে পড়তে গিয়ে কিংবা, নিজ দেশে বিদেশি শিক্ষাধারায় পড়ে পশ্চিমা সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত ছিল। তারা ছিল ডানলফ এবং তার সতীর্থদের উদ্ভাবিত বিষাক্ত উপনিবেশবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত। ইউরোপীয়রা খ্রিষ্টধর্মকে যেমন মনে করত, ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল ঠিক তেমন। তাদের ধারণা-মতে– 'ধর্ম হচ্ছে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে আবর্তিত সম্পর্ক আর একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়। দ্বীন মানে পুরোহিত-পাদরির ব্যাপার-স্যাপার। ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও বিচারব্যবস্থার কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো সময়ের পরিবর্তন এবং মানবীয় চিন্তার উন্নতির সাথে সদা পরিবর্তনশীল।'

---

১৯. আমার একাধিক বইয়ে বিভিন্ন ইসলামি সংগঠনগুলোর মাঝে অমৌলিক ও বিশেষ বিশেষ বিষয়ের মতপার্থক্য নিয়ে স্পষ্ট ও বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বিশেষ করে *আইনাল খালাল* (সমস্যা কোথায়) এবং *আস সহওয়াতুল ইসলামিয়্যাহ বাইনাল ইখতিলাফিল মাশরু ওয়াত তাফাররুক আল মাযমুম* (বৈধ মতপার্থক্য ও নিন্দিত দলাদলির মাঝে ইসলামি জাগরণ) বইতে।

www.bjilibrary.com

কথিত এই আধুনিক লোকদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর বিপরীতধর্মী দুটো বিষয়। তারা ধর্ম ও বিজ্ঞানকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বলে বেড়ায়– "ধর্ম ও বিজ্ঞান কখনও একসাথে চলতে পারে না। একটি জাগ্রত জাতি, যারা সত্যিকারার্থেই উন্নতি চায়, তারা বিজ্ঞানের পথই অবলম্বন করবে. যুবসমাজকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তুলবে।"[২০]

এ সকল কথিত আধুনিকতাবাদীরা ধর্মকে সরাসরি বাদ দেয় না বটে, তবে গুরুত্বহীন ও কর্তৃত্বহীন করে রাখতে চায়। তাদের এই বিজ্ঞানমনস্কতার বক্তব্য আসলে একটি খোলস মাত্র। তারা চায়, এর মাধ্যমে রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলামের কালজয়ী আদর্শকে অপ্রাসঙ্গিক করে রাখতে। তাদের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য মোটেও জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার বিস্তৃতি নয়। কারণ, ইসলাম ও বিজ্ঞান পরস্পর সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় নয়; বরং ইসলাম তো জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকে সব সময় উৎসাহিতই করেছে।

ইসলামি দাওয়াহর কৃত্রিম বিভাজনের মোকাবিলা

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দাওয়াতি কার্যক্রম শুরুর প্রাক্কালে পরিবেশ এমন ছিল যে– ইসলামকে ওপরে উল্লেখিত নানাবিধ বিকৃত বৃত্ত ও বৈশিষ্ট্যে কল্পনা করা হতো। তাই এই দাওয়াতি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার ওপর ইসলামের সীমিত ধারণার মোকাবিলায় ইসলামের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সংগ্রামী দিকসমূহ তুলে ধরার দায়িত্ব এসে পড়ল। আবশ্যক হয়ে পড়ল– প্রশস্ত ইসলামের ওপর চাপিয়ে দেওয়া খণ্ডিত ধারণার অপনোদন করা। সেক্যুলার চিন্তার ধারকরা ইসলামের নামে আরেকটি খ্রিষ্টবাদের জন্ম দিতে চাচ্ছিল; অথচ ইসলাম কখনোই খ্রিষ্টবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ কারণে ইমাম বান্না তাঁর গবেষণাপত্র, প্রবন্ধ, বক্তৃতা, বিবৃতি ও বয়ানে বহুবার, বহু জায়গায় এ বিষয়ে জোর দিয়েছেন যে– ইসলামের ব্যাপকতার মানে হলো ইসলামের সেই রূপ, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. নির্মাণ করেছেন। ব্যাপকতর ইসলামের এই ধারণার কারণে ইখওয়ানুল মুসলিমিন অন্য সকল সংগঠনের মাঝে বিশেষভাবে

---

২০. আমার বই *বাইয়িনাতিল হাল্লিল ইসলামি* (বিজ্ঞানের যুগে দ্বীন)-এর 'আদ দ্বীন ফি আসরিল ইলম' অধ্যায়ে তাদের এই ভ্রান্ত চিন্তাধারার অসারতা তুলে ধরে বিস্তারিত তাত্ত্বিক আলোচনা করেছি। কেউ বিস্তৃত পাঠ নিতে চাইলে বইটি পড়তে পারেন। বইটি প্রকাশ করেছে কায়রোর মাকতাবাতু ওয়াহবা এবং বৈরুতের মুয়াসসাতুর রিসালাহ।

www.bjilibrary.com

বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। ইমাম হাসান আল বান্না ইখওয়ানুল মুসলিমিনের পঞ্চম সাধারণ সম্মেলনের বক্তৃতায় ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা ও ব্যাপকতার এই তত্ত্বের নাম দেন 'ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইসলাম'।

ইসলামের এই ব্যাপকতার আঙ্গিক ও অবয়ব স্পষ্ট করার জন্য ইমাম হাসান আল বান্না বিশটি মূলনীতি সংবলিত *রিসালাতুত তায়ালিম* প্রণয়ন করেছেন। সেই বিশ মূলনীতির প্রথম নীতিটি দৃঢ় ও স্পষ্টভাবে বলছে–

> "ইসলাম এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা– যা মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব, যেমনিভাবে ইসলাম সত্য আকিদা ও বিশুদ্ধ আমল, ঠিক তেমনিভাবে ইসলাম হচ্ছে– রাষ্ট্র ও দেশ তথা শাসনব্যবস্থা ও জাতি, আখলাক ও শক্তি (Power) তথা রহমত ও আদালত, সংস্কৃতি ও আইন তথা জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিচারব্যবস্থা, পুঁজি ও সম্পদ তথা উপার্জন ও প্রাচুর্য, জিহাদ ও দাওয়াত তথা সেনাবাহিনী ও আদর্শ। ইসলামে এই উভয় দিকই সমান গুরুত্বের দাবিদার।"

কালের আবর্তনে ইসলামের ধারণা থেকে কিছু বিষয় ইচ্ছাকৃত বা অজ্ঞতাবশত অস্পষ্ট হয়ে পড়েছিল। যেমন– রাষ্ট্র, জাতি, জিহাদ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, আইন ইত্যাদি। তাই ইখওয়ানুল মুসলিমিন দাওয়াতের ক্ষেত্রে এগুলোর ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিত। এগুলোর অস্পষ্টতার পেছনে ঔপনিবেশিকদের হাত ছিল। ঔপনিবেশিকরা এর পেছনে সর্বশক্তি ব্যয় করেছে। মিলিয়ন-মিলিয়ন ডলার খরচ করে তাদের অনুগত ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করে ইসলামকে রাষ্ট্র ও বিচারালয় থেকে পৃথক করার জন্য কাজ করেছে। যেমন– আলি আবদুর রাজ্জাক তার 'ইসলাম ও শাসনব্যবস্থা' বইতে ইসলামকে শাসনকার্য থেকে পৃথক করার প্রস্তাব করেছে। কামাল আতাতুর্ক তুরস্ক রাষ্ট্র থেকে ইসলামকে আলাদা করে ছেড়েছে। ভারতবর্ষে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানি এবং ইংরেজসৃষ্ট তার অনুসারীরা ইসলাম থেকে জিহাদকে পৃথক করার কাজ করেছে।

কাদিয়ানিদের সর্বোচ্চ চেষ্টা নিয়োজিত ছিল দুটি বিষয় প্রতিষ্ঠা করার পেছনে– প্রথমত, সরকার কাফির হলেও তার আনুগত্য করতে হবে। দ্বিতীয়ত, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর বিলোপ সাধন। কাদিয়ানিদের এই দুটি আহ্বান থেকে শুধু একটি পক্ষই লাভবান হতো; আর তারা হলো– মুসলিমদের ভূমি জবরদখলকারী এবং কল্যাণের পথরুদ্ধকারী ঔপনিবেশিকরা।

www.bjilibrary.com

ইসলামের ব্যাপকতায় জোর দেওয়ার কারণ

মূলত তিনটি কারণে ইমাম হাসান আল বান্না এবং তাঁর সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমিন ইসলামের ব্যাপকতায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এই তিনটি কারণে সামগ্রিক ও ব্যাপকতর ইসলামের ধারণা গ্রহণ করা ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ওপর আবশ্যক হয়ে পড়ে।

এক. ইসলামি জ্ঞানের ব্যাপকতা

ইসলাম মানবজীবনের কেবল কোনো একটি দিক নিয়ে কথা বলেনি; বরং জাগতিক, আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক সকল দিক নিয়েই কথা বলেছে। এ সবকিছুই ইসলামের নির্দেশনার গণ্ডির ভেতরে অবস্থান করছে। কুরআনুল কারিমের সবচেয়ে বড়ো আয়াতটি জাগতিক বিষয়ে নাযিল হয়েছে। আর সেই আয়াত হলো ঋণের বিধান সংক্রান্ত আয়াত–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۭ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۠ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـــًٔا ۭ... ﴿٢٨٢﴾

"হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান করো, তখন তা লিখে রাখো। তোমাদের মধ্যে কোনো লেখক ন্যায়সংগতভাবে তা লিখে দেবে। যারা লিখতে পারে তারা যেন লিখতে অস্বীকার না করে; আল্লাহ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেওয়া। আর ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশ-কম না করে।" সূরা বাকারা : ২৮২

যে কুরআনে কারিম বলছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ... ﴿١٨٣﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে...।" সূরা বাকারা : ১৮৩

সে কুরআনই আবার বলছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ... ﴿١٧٨﴾

"হে ঈমানদারগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাস (দণ্ডবিধান) ফরজ করে দেওয়া হলো...।" সূরা বাকারা : ১৭৮

www.bjilibrary.com

একই কুরআন বলছে–

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ...﴿١٨٠﴾

"তোমাদের ওপর এ বিধান দেওয়া হলো যে, যখন তোমাদের মধ্যে ধনসম্পদ আছে এমন কারও কাছে মৃত্যু এসে পড়ে, তাহলে সে যেন মাতাপিতা ও আত্মীয়দের জন্য ন্যায়সংগতভাবে ওসিয়ত করে...।"
সূরা বাকারা : ১৮০

একই সূরাতে কুরআনে হাকিম বলছে–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ...﴿٢١٦﴾

"যুদ্ধকে তোমাদের ওপর ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। হতে পারে এটা তোমাদের কাছে অপ্রিয়; অথচ তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক।"
সূরা বাকারা : ২১৬

কুরআন উপর্যুক্ত বিষয়গুলো ফরজ করার ক্ষেত্রে একই শব্দ كُتِبَ عَلَيْكُم ব্যবহার করেছে। আল্লাহপাক এগুলোর সবই মুসলিমদের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন। সিয়াম ইবাদতের অধ্যায়ে, কিসাস ফৌজদারি আইনের অধ্যায়ে, ওসিয়ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন অধ্যায়ে এবং কিতাল (যুদ্ধ) আন্তর্জাতিক নীতি অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এ সবই আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য নির্ধারণ করেছেন। মূলত এগুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুমিনরা আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করে। সুতরাং, কোনো মুমিন সিয়াম পালন করবে আর কিসাস, ওসিয়ত ও কিতাল বর্জন করবে– এটা হতে পারে না।

ইসলামি শরিয়ত তার অনুসারীদের সকল কাজের পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়। প্রত্যেকটি কাজই পাঁচটি শরয়ি হুকুমের কোনো একটির আওতার মধ্যে পড়বে। এতে সকল ফকিহ ও উসুলবিদ একমত। ইসলামের এই ব্যাপকতার বিষয়ে কুরআন-হাদিস থেকে প্রচুর দলিল উপস্থাপন করা যায়। আল্লাহ তায়ালা রাসূল সা.-কে উদ্দেশ করে বলেন–

...وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

"আমি আপনার প্রতি এমন কিতাব নাযিল করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত এবং মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ।"
সূরা নাহল : ৮৯

www.bjilibrary.com

এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, রাসূল সা. এমন সবকিছুই বলে গিয়েছেন, যা আমাদের আল্লাহর নৈকট্যের দিকে নিয়ে যাবে। আর যা দূরে ঠেলে দেবে– তাও বলে গেছেন। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সা. আমাদের জন্য রেখে গেছেন সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড–

لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلاَّ هَالِكٌ.

"তার রাতও দিনের মতো। যে তা থেকে বিচ্যুত হবে, সে হবে ধ্বংসপ্রাপ্ত।"[২১]

সুতরাং, ইসলাম পুরো জীবনের জন্য বার্তা বহন করে, সকল মানুষের জন্য বার্তা বহন করে। একইভাবে, ইসলামের বার্তা বিশ্বের সকল ভূখণ্ড, জনপদ এবং সকল যুগের জন্য।[২২]

দুই. খণ্ডিত দ্বীন-চর্চা ইসলাম-সমর্থিত নয়

ইসলাম তার বিধিবিধানের কিছু গ্রহণ ও কিছু বর্জনের কোনো সুযোগ রাখেনি। বনি ইসরাইল এ ধরনের দ্বিমুখী নীতির কঠোর সমালোচনা করেছে কুরআন–

...أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস করো? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে, তাদের পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া কিছুই নেই এবং কিয়ামত দিবসে তারা কঠোর শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। আর তোমরা যা করছ– আল্লাহ সে বিষয়ে উদাসীন নন।" সূরা বাকারা : ৮৫

---

২১. ইবনে মাজাহ : ৪৩। হাদিসটি ইমাম আহমাদ তাঁর গ্রন্থ মুসনাদে সংকলন করেছেন। ইমাম হাকিম সংকলন করেছেন ইরবাদ ইবনে সারিয়ার সূত্রে; মুসতাদরাক : ৯৬, ৯৭/১

২২. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পড়তে পারেন– আমার বই *আল খাসায়িসুল আম্মাহ লিল ইসলাম* (ইসলামের সাধারণ বৈশিষ্ট্য)-এর ব্যাপকতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা। আরও পড়তে পারেন– আমার বই *আস সহওয়াতুল ইসলামিয়্যা ওয়া হুমুমুল ওতান আল আরাবি* (ইসলামি জাগরণ ও আরব ভূখণ্ডের উৎকণ্ঠা) বইয়ের 'ইসলামের ব্যাপকতার ধারণা ও ইসলামকে ভাগ করার ভয়াবহতা' অংশ, পৃষ্ঠা : ৬৮-৯৮

www.bjilibrary.com

কতক ইহুদি তাদের ধর্মের কিছু বিধান এবং শনিবারের পবিত্রতা বহাল রেখে ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে আল্লাহর রাসূল তাদের সে প্রস্তাব এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে– ইসলামে প্রবেশ করতে চাইলে সম্পূর্ণভাবেই প্রবেশ করতে হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ﴿٢٠٨﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।"[২৩] সূরা বাকারা : ২০৮

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর রাসূল সা.-কে সতর্ক করেছেন, যেন অমুসলমিরা তাকে ইসলামের কোনো বিধান থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। এই সতর্কতা শুধু রাসূলুল্লাহর জন্যই নয়; বরং উম্মাহর যারাই ইসলামের জন্য কাজ করবে, তাদের সকলের জন্য প্রযোজ্য।

বস্তুত ইসলামের বিধিবিধানসমূহ যেমন– শরিয়ত, আকিদা, আখলাক, ইবাদত, মুআমালাত– যে অঙ্গনেরই হোক না কেন, তা পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রহণ করা ছাড়া ফলপ্রসূ হয় না। কারণ, ইসলামের বিধানগুলো একটি অন্যটির ওপর নির্ভরশীল; একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কিত। ইসলামের বিধিবিধানের উদাহরণ ডাক্তারি প্রেসক্রিপশনের মতো। একটি প্রেসক্রিপশন কিছু খাবার গ্রহণ, কিছু ওষুধ সেবন, কিছু কাজ থেকে বিরত থাকা এবং কিছু নিয়মিত অনুশীলনের সমন্বয়ে তৈরি হয়ে থাকে। প্রেসক্রিপশনের কার্যকারিতার জন্য এর সবগুলোই অনুসরণ করতে হয়। প্রেসক্রিপশনের এই সামগ্রিক অনুসরণ মানবশরীরকে একটি ফলপ্রসূ অবস্থার দিকে পরিচালিত করে। প্রেসক্রিপশনের প্রত্যেকটি দিক তখন পূর্ণ সক্রিয়তার সাথে কাজ করে। কিন্তু এর কোনো একটি দিকের অনুসরণ যদি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে গোটা প্রেসক্রিপশনের কার্যকারিতার ওপর প্রভাব পড়বে।

---

২৩. ইমাম ইবনে কাসির এ আয়াতের তাফসিরে বলেন– "আল্লাহ তায়ালা তাঁর যেসকল বান্দা তাঁর ওপর ইমান এনেছে এবং তাঁর রাসূলকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে তাদের আদেশ দিয়ে বলছেন, তারা যেন ইসলামের সকল বৈশিষ্ট্য এবং বিধানকে গ্রহণ করে, তাদের সাধ্যানুযায়ী সকল আদেশ পালন করে এবং সকল নিষেধ মেনে চলে।" *তাফসিরে ইবনে কাসির*, ২৪৭/১, ইহইয়াউত তুরাস আল আরাবি, বৈরুত।

www.bjilibrary.com

তিন : জীবন অভিভাজ্য

মানবজীবন অভিভাজ্য; একে একাধিক ভাগে ভাগ করার কোনো সুযোগ নেই। যদি মানবজীবনের একটি অংশ মসজিদ ও মসজিদমুখী দর্শনের কাছে সপে দেওয়া হয়, আর অপর অংশটি চলে মানবরচিত দর্শন ও বিধি অনুযায়ী, তাহলে সেই জীবনের পরিশুদ্ধি কখনোই সম্ভব হবে না। ইসলামের জন্য বরাদ্দ থাকবে কেবল মসজিদ। অন্যদিকে স্কুল, কলেজ, আইন-আদালত, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, নাটক, সিনেমা, বাজার, মহাসড়ক– এককথায় অন্য সব কিছু চলবে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে। তাহলে কীভাবে সাফল্য সম্ভব!

মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জীবন দুটি ভিন্ন সুতোয় গাঁথা থাকতে পারে না। আধ্যাত্মিক দিক চলবে দ্বীনের অনুকরণে, আর বৈষয়িক ও চিন্তাগত দিক চলবে ধর্মহীন রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুকরণে– এটি মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। মানবজীবনে দ্বিমুখিতার কোনো সুযোগ নেই। মানুষ কিংবা তার জীবন কোনোটাকেই বিভক্ত করার সুযোগ নেই।

একজন মানুষ তার রুহ ও দেহের সমন্বয়ে গঠিত। এ দুটোর মাঝে কীভাবে বিভাজন করা সম্ভব? এমন বিভাজন বিজ্ঞানসম্মতও নয়। জীবনের ব্যাপারেও একই কথা। মানুষকে যেমন ভাগ করা যায় না, তেমনি মানুষের জীবনকেও ভাগ করা যায় না।

ঐতিহাসিক ও সামসময়িক প্রত্যেকটি দর্শন ও বিপ্লবী আদর্শই নিজ নিজ অঙ্গনে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। তারা জীবনের বিভক্তিকে বর্জন করেছে। জীবনের কোনো একটি অংশের ওপর অন্য কিছুর ছড়ি ঘোরানো তারা বরদাশত করে না। তারা নিজ দর্শনের আলোকে পুরো জীবনকেই পরিচালনা করতে চায়। অস্তিত্ব, জ্ঞান ও মূল্যবোধ সবই পরিচালিত হবে আদর্শের আলোকে।

আরবের একজন প্রখ্যাত সমাজতান্ত্রিক লেখক[২৪] এ প্রসঙ্গে বলেন–

> "সমাজতন্ত্রকে শুধু একটি অর্থনৈতিক দর্শন ভাবা যথার্থ নয়। এ কথা সত্য যে– সমাজতন্ত্র বহু অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দেয়, কিন্তু এটি সমাজতন্ত্রের একটি অংশ মাত্র। শুধু এই একটি দিক থেকে সমাজতন্ত্রকে

---

২৪. ড. মুনিফ আর রযযার। তিনি একসময় 'হিযবুল বা-স আল ইশতিরাকি আল আরাবি'র সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তার বই *দিরাসাত ফিল ইশতিরাকিয়্যাহ*-তে কথাগুলো এসেছে। বইটি ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়, আর এ বইতে তার দলের বেশ কিছু নেতার প্রবন্ধও সংযুক্ত ছিল।

www.bjilibrary.com

বোঝার চেষ্টা করলে ভুল হবে; সমাজতন্ত্রের গভীরে আর প্রবেশ করা হবে না। সেইসাথে সমাজতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না এবং এর দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যেও পৌঁছানো যাবে না।"

লেখক দাবি করেন–

"সমাজতন্ত্র একটি জীবনঘনিষ্ঠ মতবাদ। সমাজতন্ত্র শুধু অর্থনৈতিক মতবাদ নয়; এটি অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, মানোন্নয়ন, সমাজ, স্বাস্থ্য, চরিত্র, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাস– সবকিছুতেই অংশগ্রহণ করে। জীবনের প্রত্যেকটি ছোটো-বড়ো বিষয়ে সমাজতন্ত্রের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আপনি সমাজতান্ত্রিক– এর অর্থ, উল্লিখিত সব বিষয়ে আপনার সমাজতান্ত্রিক জ্ঞান ও বিপ্লবী স্পিরিট রয়েছে।"

লেখক জোর দিয়ে বলেন–

"এটি শুধু সমাজতন্ত্রের দর্শনই নয়; বরং অন্য সব কম্যুনিস্ট ধারার মূলমন্ত্রও এটি।"

লেখক সমাজতান্ত্রিক মতগুলোর ব্যাপ্তি ও সামগ্রিকতা বর্ণনার পর বলেছেন–

"সকল ক্ষেত্রেই সমাজতন্ত্রের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। সকল সমস্যার সমাধান এখানেই।"

এই পূর্ণাঙ্গতা তত্ত্বের পেছনের কারণ হলো– জীবন একটি অবিচ্ছেদ্য ও অভিভাজ্য বিষয়। জীবন একটি সামগ্রিক প্রবাহ। জীবন মনুষ্যবুদ্ধি-প্রসূত কোনো বিভাজন মানে না। জীবনের মর্ম বোঝার জন্য এ বিভাজন আমরাই সৃষ্টি করি। অতঃপর একপর্যায়ে ভুলে যাই যে, এ বিভাজন আমাদেরই সৃষ্টি। সম্ভবত, এ বিভাজন মানব-ইতিহাসের শুরু থেকেই চলে আসছে।

জীবন মানে কেবল অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি নয়; বরং জীবন এ সবের সমন্বয়ে গঠিত একটি সামগ্রিক ধারণার নাম। কখনও কখনও আমাদের দুর্বল চিন্তা জীবনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে ভুল করে। যদি জীবন নিজেই স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে বিভিন্ন রং ও সম্পর্কের দিকে ভাগ করতে চায় যে –তার একটা অংশ রাজনীতির, একটা অংশ অর্থনীতির, একটা অংশ সামাজিকতা, আরেকটা অংশ চরিত্র বা দ্বীনের, আরেকটা অংশ সাহিত্য বা বিজ্ঞানের– তাহলে সে তা পারবে না। নদীর প্রবাহের মতো জীবনও সর্বদা বহমান। একইভাবে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি, সরকার, রাজনৈতিক দল– সবই সময়ের প্রবাহে গতিশীল; তাদের গণ্ডি ছোটো বা বড়ো যা-ই হোক না কেন!

www.bjilibrary.com

কোনো সমাজের রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয়। আবার অর্থনীতি সেখানকার রাজনৈতিক স্বাধীনতার সিদ্ধান্তে ভূমিকা রাখে। একইভাবে আবাসন, চরিত্র, শিক্ষাব্যবস্থা, সাহিত্য ইত্যাদি একটি অপরটির গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে প্রভাব রাখে। সেই লেখক সমাজতন্ত্রের কিছু মৌলিক গুণের বর্ণনার মাধ্যমে বইটি শেষ করেছেন। তিনি বলেছেন–

> "এই অর্থে সমাজতন্ত্রকে শুধু অর্থনৈতিক মতবাদের অর্থে ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না; বরং এটি জীবন সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদ।"

এই হলো আগাগোড়া বিপ্লবী আদর্শে বিশ্বাসী একটি মতবাদের অবস্থা। তাহলে ইসলামকে কেন শুধু মসজিদ এবং শরিয়াহ আদালতে সীমাবদ্ধ করা হবে; অথচ প্রকৃতিগতভাবেই ইসলাম বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র ও সভ্যতার সমষ্টি। বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষে যদি সম্ভব হতো, তবে তারা মসজিদ ও শরিয়াহ আদালতকেও ইসলামের স্বাতন্ত্র্যের ওপর ছেড়ে দিত না।[২৫]

বাইবেল বলে–

> "যা কায়সারের (সম্রাটের), তা কায়সারের জন্য ছেড়ে দাও। আর যা আল্লাহর, তা আল্লাহর জন্য ছেড়ে দাও।"

যখন খ্রিষ্টান যাজকরা শক্তি ও সুযোগ পেয়েছে, তখন কায়সারের জন্য কিছুই ফেলে রাখেনি। বরং যাজকরাই তখন সমাজ ও রাষ্ট্রের মোড়ল হয়ে বসেছে। তখন যাজকরা মানবসমাজ ও মানবজীবনকে সাজিয়েছে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে, আচরণ করেছে নতুন-পুরাতন অন্য সকল ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের ধারকদের মতোই। এটাই যখন খ্রিষ্টবাদের অবস্থান, তখন বস্তুগত ও আধ্যাত্মিকতার মাঝে বিভক্তির বিরোধী আদর্শ ইসলাম কীভাবে জীবনের বিভাজনকে সমর্থন করবে? ইসলাম তো জীবনকে কায়সার ও আল্লাহর মাঝে ভাগ করে দেওয়া সমর্থন করে না; বরং ইসলামের দৃষ্টিতে কায়সারসহ কায়সারের সবকিছুরই মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা।

---

২৫. মুসলিম বিশ্বের অনেকগুলো দেশে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারগুলো শরিয়াহর কিছু অংশ বলবৎ রেখেছে। আর তা হচ্ছে পারিবারিক আইন সংক্রান্ত বিষয়াবলি বা যাকে 'মুসলিম পারিবারিক আইন' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু সেসব দেশের মসজিদের এই স্বাধীনতা নেই যে, ইসলামের বার্তা নিজের মতো করে বলবে; বরং মসজিদে তা-ই বলা হয়ে থাকে, যা প্রশাসন চায়।

www.bjilibrary.com

কুরআনে হাকিম বলছে–

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ... ﴿١١٤﴾

"তবে কি আমি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে বিধানদাতা মানব; অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করেছেন!" সূরা আনআম : ১১৪

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ۭ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٥٠﴾

"তবে কি তারা জাহেলি যুগের বিধিবিধান আশা করে? দৃঢ়বিশ্বাসী লোকদের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে উত্তম কে আছে!" মায়িদা : ৫০

পূর্ণাঙ্গ ইসলামের মৌলিক দিকসমূহ

ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর বিশ মূলনীতির প্রথম নীতিতে ইসলামের বেশকিছু মৌলিক দিক তুলে ধরেছেন। এগুলো হলো–

রাজনৈতিক দিক : এ দিকটি বোঝাতে ইমাম বান্না বলেছেন, 'ইসলাম হচ্ছে রাষ্ট্র ও দেশ তথা শাসনব্যবস্থা ও জাতি।'

চারিত্রিক দিক : এই দিককে ইমাম বান্না সংযুক্ত করেছেন 'আখলাক ও শক্তি তথা রহমত ও আদালত' শব্দাবলি দিয়ে।

সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানগত দিক এবং আইনি ও বিচারিক দিক : এগুলোকে ইমাম হাসান আল বান্না ব্যাখ্যা করেছেন 'সংস্কৃতি ও আইন তথা জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিচারব্যবস্থা' শব্দগুচ্ছ দ্বারা ।

অর্থনৈতিক দিক : এটার বর্ণনায় ইমাম বান্না 'পুঁজি ও সম্পদ তথা উপার্জন ও প্রাচুর্য' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন।

জিহাদ ও দাওয়াত : এ দুটোকে ইমাম বান্না 'জিহাদ ও দাওয়াত তথা সেনাবাহিনী ও আদর্শ' শব্দাবলির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

বিশ্বাস ও কর্ম : এ দুটি বিষয় সকল ধর্মের মৌলিক দিক। এ দুটোকে ইমাম বান্না 'বিশুদ্ধ আকিদা ও একনিষ্ঠ ইবাদত' শব্দদ্বয় দ্বারা বুঝিয়েছেন।

www.bjilibrary.com

ইমাম হাসান আল বান্নার ধ্যান-জ্ঞানে এসব বিষয় ছিল সর্বদা জাগরুক। ইসলামি জীবনাদর্শে এগুলো সুনিশ্চিত ও স্বতঃস্ফূর্ত বিষয় বলে গণ্য। কুরআন ও সুন্নাহ এবং সালফে সালিহিনের পথনির্দেশনা ও ইমামদের কথায় এসবের বিস্তারিত দলিল পাওয়া যায়।

ইমাম হাসান আল বান্না যখনই সুযোগ পেতেন, তখনই এর প্রতিটি বিষয়ের ওপর তাকিদ দিয়ে কথা বলতেন। অনেকে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে একেবারেই গাফিল– ইমাম বান্না তাদের জানিয়ে দিতে চাইতেন। অনেকে এসব বিষয়াদি সম্পর্কে জানে বটে, কিন্তু অমনোযোগী– তিনি তাদের সতর্ক করে দিতে চাইতেন। আবার কেউ দুনিয়ার ব্যস্ততায় এ ব্যাপারগুলো ভুলে বসে আছে– তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাইতেন। যাতে এই তৎপরতার মাধ্যমে সংশয়গ্রস্তদের কর্মে বলিষ্ঠতা আসে, আর ঈমানদারদের ঈমান আরও সুদৃঢ় হয়। ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতি, সাধারণ সম্মেলনের ভাষণ, বিশেষ সাক্ষাৎকার ও বৈঠকসমূহ, পাঠদান ও ক্লাস, তাঁর গবেষণাপত্র ও প্রবন্ধ প্রত্যেকটি জায়গায় এ বিষয়গুলোতে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।

ইমাম হাসান আল বান্নার প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ আমাদের উপর্যুক্ত কথার পক্ষে প্রমাণ। হিজরি ১৩৫৭ সালে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের পঞ্চম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে 'ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইসলাম' শীর্ষক বক্তৃতায় ইমাম বান্না ইসলামের ব্যাপকতা ও পরিপূর্ণতা নিয়ে কথা বলেছেন।[২৬] তিনি সেখানে আলোচনা করেছেন ইসলামের সামগ্রিকতা বিষয়ক চিন্তা ও কর্মের পরিধি নিয়ে। জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এই চিন্তাধারা কী কী কর্মচাঞ্চল্য আনতে পারে– সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

একই বছর ইখওয়ানের ছাত্র শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইমাম বান্না সেখানে দ্বীন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং ইসলামি শরিয়তের প্রশস্ততা নিয়ে কথা বলেছেন।

বাদশাহ ফারুক, মিশরের সরকারপ্রধান, মুসলিম বিশ্বের অনেক শাসক, সরকারপ্রধান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে ইমাম হাসান আল বান্না একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এই পত্রটি 'রিসালাতু নাহওয়ান নূর' নামে পরিচিত। ১৩৬৬ হিজরিতে পাঠানো এ চিঠিতে ইমাম বান্না লিখেছেন–

"ইসলামই কর্মতৎপর উম্মাহর সকল রসদের জোগানদাতা।"

---

২৬. দেখুন, বইয়ের পরিশিষ্টে সংযুক্ত ইমাম হাসান আল বান্নার বক্তৃতা।

www.bjilibrary.com

'ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংকট' শিরোনামের কলামে ইমাম হাসান আল বান্না একই কথার পুনরোল্লেখ করেছেন। 'ইখওয়ানুল মুসলিমিন' পত্রিকায় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের উদ্দেশে তিনি এ কলাম লিখতেন।

এ বইতে আমরা ইমাম হাসান আল বান্নার বিশ নীতিমালার প্রথম নীতি নিয়ে কথা বলছি। তবে প্রথম নীতিতে বর্ণিত নয়টি দিকের সবগুলো দিক আমরা এখানে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব না। কেননা, এ সবগুলো দিকের ব্যাখ্যা মানে গোটা ইসলামেরই ব্যাখ্যা। আমরা এখানে শুধু দুটি দিকের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে চাই। এ দুটি বিষয়কে ইমাম বান্না বেশ গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছেন। কেননা, তাঁর সময়ের অধিকাংশ মানুষ এ দুটি দিকের ব্যাপারে তেমন একটা জানত না। আর যারা জানত, তারাও অবহেলা করত।

এ দুটি দিক হলো– রাষ্ট্র ও জিহাদ। অর্থাৎ, রাজনীতি ও জিহাদ। ইসলামে এ দুটোর অবস্থান এবং সার্বিক দিক বিবেচনায় এখানে আমরা নাতিদীর্ঘ আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

*****

www.bjilibrary.com

রাষ্ট্র, রাজনীতি ও ইসলাম

ইসলামে রাষ্ট্রের অবস্থান

ইমাম হাসান আল বান্না ইসলামের ব্যাপকতা বর্ণনায় সর্বপ্রথম রাষ্ট্রের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন– "যেমনিভাবে ইসলাম আকিদা ও ইবাদত, তেমনিভাবে ইসলাম হচ্ছে রাষ্ট্র ও ভূখণ্ড।" এই বাস্তবতাটির ঘোষণা এবং এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ ইসলামের প্রথম যুগের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইমাম বান্না তাঁর প্রত্যেকটি প্রবন্ধ ও আলোচনায় রাষ্ট্র ও ভূখণ্ডের ওপর গুরুত্ব দিতেন। আর এই গুরুত্ব দেওয়ার কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

মুসলিমদের ভূখণ্ড জবরদখলকারী ঔপনিবেশিকরা অনেক মুসলিমের চিন্তায় এই বীজ বপন করতে সক্ষম হয়েছে যে– 'ইসলাম শান্তির ধর্ম; রাষ্ট্র বা রাজনীতির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই'। তাদের চিন্তায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে– 'ধর্ম মানেই পশ্চিমা চিন্তাধারার ধর্ম। রাষ্ট্রীয় কাজের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। রাষ্ট্রকে মানুষ স্বীয় বিচারবুদ্ধির নিরিখে সদা পরিবর্তনশীল চাহিদা এবং নিজ নিজ দক্ষতার আলোকে সাজিয়ে নেবে।'

পশ্চিমে খ্রিষ্টবাদের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে, প্রাচ্যে ইসলামের সাথে ঔপনিবেশিকরা একই আচরণ করতে চেয়েছে। ঔপনিবেশিকদের মতে– 'পশ্চিমে ধর্মের শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোনো বিপ্লব পূর্ণতা পায়নি। সুতরাং, প্রাচ্য তথা আরব কিংবা মুসলিম বিশ্বে বিপ্লব করতে চাইলে, অবশ্যই তা ধর্মের বিরুদ্ধেই করতে হবে।' অথচ প্রকৃত ব্যাপার হলো– পশ্চিমে ধর্ম মানে গির্জা ও পাদরির একচ্ছত্র ক্ষমতা; মানুষের অনুভূতি ও হৃদয়ের ওপর পুরোহিতদের স্বেচ্ছাচারিতা। আমাদের দ্বীন ইসলামে এর সুযোগ কোথায়! ইসলামে কোনো পোপ-পাদরি বা পুরোহিত নেই। নেই কোনো ধর্মীয় যাজকতন্ত্র। সুযোগ নেই হৃদয়-মনের সাথে কোনো স্বেচ্ছাচারিতারও।[২৭]

---

২৭. দেখুন, ড. মুহাম্মাদ বাহির *আল ফিকরুল ইসলামি আল হাদিস ওয়া সিলাতুহু বিল ইসতিমার আল গারবি* বইয়ের 'দ্বীনুন লা দাওলাহ' অধ্যায়।

www.bjilibrary.com

ঔপনিবেশিকরা মুসলিমদের মাঝে এমন একটি পক্ষ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, যারা মনে করে– 'রাষ্ট্র পরিচালনা ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণে দ্বীনের কোনো ভূমিকা নেই। আর দ্বীন ও রাজনীতি সম্পূর্ণ পৃথক দুটি ব্যাপার।' তারা বলে– 'এটি ইসলামের ক্ষেত্রেও সত্য, যেমনি সত্য খ্রিষ্টবাদের ক্ষেত্রেও।' ঔপনিবেশিকরা একটি প্রবাদের বহুল প্রচলন ঘটিয়েছে। সেই প্রবাদটি হলো– الدين لله والوطن للجميع 'দ্বীন আল্লাহর, রাষ্ট্র সবার'। কথাটি সত্য বটে, কিন্তু এই কথার প্রচলন ও প্রচারের ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য খারাপ।

ঔপনিবেশিকরা 'দ্বীন আল্লাহর' কথাটার মধ্যে দ্বীনের অর্থ করেছে– 'বান্দার ব্যক্তিসত্তার সাথে আল্লাহর একান্ত সম্পর্ককে'। অর্থাৎ, দ্বীনের অবস্থান কেবল ব্যক্তিগত জীবনে; এর বাইরে রাষ্ট্র বা সমাজের অঙ্গনে দ্বীনের কোনো অবস্থান নেই। এ চিন্তাধারার জলন্ত উদাহরণ হলো– কামাল আতাতুর্ক সৃষ্ট ধর্মনিরপেক্ষ তুর্কি রাষ্ট্র। নিপীড়ন, জুলুম, রক্তবন্যা আর অস্ত্রের মুখে তুর্কি মুসলিমদের ওপর এই ধর্মনিরপেক্ষতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাথে যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ করে টিকে থাকা ইসলামের সর্বশেষ রাজনৈতিক দুর্গ উসমানি খিলাফত ভেঙে পড়ার পর মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষতা আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এরপর বেশ কিছু মুসলিম সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিক তুরস্ককে অনুসরণ করতে শুরু করে। তারা ফৌজদারি ও নাগরিক আইন ইত্যাদি থেকে ইসলামকে সরিয়ে দেয়। ইসলামকে সীমাবদ্ধ করা হয় শুধু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইনে। আসলে এর মাধ্যমে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক বিষয়াদি থেকে ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি ও রীতিনীতির অনুপ্রবেশের জন্য মুসলিম বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে ।

আরবের বড়ো বড়ো রাজনৈতিক নেতারা আতাতুর্কের কর্মকাণ্ডকে অনুসরণ ও পছন্দ করে। আর পছন্দ করার এই বিষয়টাকে তারা গোপন করার প্রয়োজনও বোধ করে না। এমনকি তৎকালীন মিশরের সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক দলের নেতা এবং ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যেই বলেন– "আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তায় কামাল আতাতুর্কের পদক্ষেপ আমি পছন্দ করছি।" ইমাম হাসান আল বান্না তার কথার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করেন।

www.bjilibrary.com

পশ্চিমাদের আগ্রাসী সাংস্কৃতিক যুদ্ধের সবচেয়ে বড়ো দৃশ্যমান বিজয় হলো– তাদের ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা শুধু আধুনিক নাগরিকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, আগাগোড়া ইসলামি ধারায় পড়াশোনা করা কিছু লোকও তাদের চিন্তায় প্রভাবিত হয়েছে। এমনকি আল আযহারের মতো প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের কতিপয় ব্যক্তিও তাদের সাথে একাত্ম হয়েছে! আলী আবদুর রাজ্জাক লিখিত *আল ইসলাম ওয়া উসুলুল হুকুম* (ইসলাম ও শাসনব্যবস্থা) বইটি তার প্রমাণ।

উল্লেখ্য, আলী আবদুর রাজ্জাকের বইটি প্রকাশের পর জনসাধারণের মাঝে এবং বিশেষ করে আল আযহারের ভেতরে রীতিমতো হইচই পড়ে যায়। আল আযহার শীর্ষ আলিমদের নিয়ে তার জন্য সালিশি বৈঠক ডাকে। সেখানে তাকে আলিমদের অঙ্গন থেকে বহিস্কৃত ঘোষণা করা হয়। আবদুর রাজ্জাকের বইটির বিরুদ্ধে আল আযহার এবং আল আযহারের বাইরের আলিমরাও মজবুতভাবে কলম ধরেন।[২৮]

এসব কারণে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থক-পৃষ্ঠপোষকদের মোকাবিলায় ইসলামের ব্যাপকতা তুলে ধরা অধিক গুরুত্ববহ হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামি শিক্ষা ও বিধিবিধানে ইসলামের জীবন্ত দিকগুলো স্পষ্ট করা জরুরি হয়ে পড়ে। যেমন– রাষ্ট্রগঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি এবং শাসনব্যবস্থার শিষ্টাচার। এই বাস্তবতায় এটি ঘোষণা করা ওয়াজিব হয়ে পড়ল যে– 'রাষ্ট্র, শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। একে ইসলাম থেকে আলাদা করা যায় না।'

ইসলামি জ্ঞানের উৎস থেকে দলিল

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো কোনো ইসলামি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা কিংবা নেতাকর্মীদের উদ্ভাবিত কথা নয়। ইসলামি জ্ঞানের মৌলিক উৎসে এর জোরালো বয়ান এসেছে। ইসলামের ইতিহাস এবং যুগে যুগে দাওয়াতি কার্যক্রমে রয়েছে তার অজস্র দলিল-প্রমাণ। ইসলামি জ্ঞানের উৎসের অগণিত দলিল থেকে নিম্নোক্ত দুটি আয়াতই এর জন্য যথেষ্ট।

---

২৮. আবদুর রাজ্জাকের এই ভ্রষ্টতা প্রত্যাখ্যান করে যারা লিখেছেন, তাদের মধ্যে সাবেক শাইখুল আজহার মুহাম্মাদ খিযির হুসাইনও আছেন। তাঁর বইটির নাম– *নাকদু কিতাবিল ইসলাম ওয়া উসুলিল হুকুম*।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا ۙ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْٓا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ... ﴿٥٩﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ হকদারদের কাছে পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার-ফয়সালা করবে, তখন তা ন্যায়পরায়ণতার সাথেই করবে। আল্লাহ তোমাদের সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী। হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো, নির্দেশ মান্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা (শাসন ও বিচারের) দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের। তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ো, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ করো...।" সূরা নিসা : ৫৮-৫৯

প্রথম আয়াতে রাষ্ট্রের প্রশাসক ও বিচারকদের উদ্দেশে বলা হয়েছে– তারা যেন আমানত রক্ষা করে এবং ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করে। আমানত ও ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতি উম্মাহকে ধ্বংস করে দেয় এবং দেশকে চরম ক্ষতির দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। সহিহ হাদিসে এসেছে–

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ". قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ "إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ".

"নবি সা. বলেন– 'যখন আমানতদারিতা উঠে যাবে, তখন কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করবে।' সাহাবিদের মধ্য থেকে একজন প্রশ্ন করলেন– 'কীভাবে আমানত হারিয়ে যায়?' রাসূল সা. বললেন– 'যখন অনুপযুক্ত ব্যক্তির ওপর কোনো দায়িত্ব অর্পণ করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো'।"[২৯] বুখারি : ৫৯

---

২৯. ইমাম বুখারি *কিতাবুল ইলম*-এ হাদিসটি সংকলন করেছেন; হাদিস নং : ৫৯; আল ফাতহ : ১৪১/১; রাবি : আবু হুরায়রা রা.; তিনি *কিতাবুর রিকাক*-এ হাদিসটি পুনরায় উল্লেখ করেন।

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় আয়াতে সাধারণ মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। তারা যেন দায়িত্বপ্রাপ্তদের আনুগত্য করে। শর্ত হলো– এই দায়িত্বপ্রাপ্তরা তাদের মধ্য থেকে হবেন। এই আনুগত্যকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পরে আনা হয়েছে। মতবিরোধকালে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মানদণ্ড ধরতে বলা হয়েছে। এসব কিছুর চূড়ান্ত দাবি হচ্ছে– মুসলিমদের নিজেদের রাষ্ট্র থাকবে। সবাই এই রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করবে। যদি রাষ্ট্রই না থাকে, তাহলে ওপরের আদেশগুলো দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক!

এই আয়াত দুটোর বিস্তারিত তাফসির পাওয়া যাবে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার– السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية (শাসক ও শাসিতের কল্যাণে শরয়ি রাজনীতি) শিরোনামীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থে। পুরো বইটি এই দুই আয়াতের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

এরপর সুন্নাহর দলিলের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। রাসূল সা. বলেন–

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

"কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে, অথচ তার গলায় বাইয়াত নেই, সে জাহিলি মৃত্যুবরণ করেছে।"[৩০]

ইসলামের বিধান লঙ্ঘনকারী কোনো ব্যক্তির হাতে তো একজন মুসলিম কোনোভাবেই বাইয়াত গ্রহণ করতে পারে না। এটা হারাম। যে বাইয়াত আমাদের মুক্তি দেবে তা হলো– আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালাকারীর হাতে বাইয়াত। যতক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের বাইয়াতের পরিবেশ অনুপস্থিত থাকবে, ততক্ষণ প্রত্যেক মুসলিম অবিশ্রান্তভাবে গুনাহর ভাগিদার হতে থাকবে। কাঙ্ক্ষিত বাইয়াত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত কেবল দুটি কাজই এ গুনাহ থেকে আমাদের মুক্তি দিতে পারে। যথা :

এক. ইসলামি শরিয়তবিরোধী সকল কায়েমি ব্যবস্থার বিরোধিতা করা– অক্ষমতার ক্ষেত্রে অন্তত মনে মনে হলেও।

দুই. সুদৃঢ়ভাবে ইসলামি জীবনব্যবস্থা পুনর্প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সর্বদা সক্রিয় থাকা, যেন এই সম্মিলিত চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা ফিরে আসে।

---

৩০. ইমাম মুসলিম আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে *কিতাবুল ইমারা*-য় হাদিসটি সংকলন করেছেন। হাদিস নং : ১৮৫১

www.bjilibrary.com

খিলাফত, ইমারত, বিচার, ইমাম (শাসক-নেতা), ইমামের গুণাবলি, নাগরিকদের ওপর তার অধিকার, কল্যাণমূলক কাজে সহায়তা, দায়িত্বশীলের জন্য উপদেশ, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় আমীরের আনুগত্য, দায়িত্বশীলদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ, আল্লাহ নির্ধারিত দণ্ডসমূহ বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে রয়েছে অগণিত দলিল। মানুষের অধিকার সংরক্ষণে শাসকের দায়িত্বসমূহ, বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ, সুস্থ-সবল ও শক্তিমানদের তত্ত্বাবধান, অসুস্থদের সেবা, সালাত প্রতিষ্ঠা, যাকাত আদায়, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম, বিচারিক আইন, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বিধি সম্পর্কে এসেছে অজস্র হাদিস।

আমরা ইমামত ও খিলাফতসংক্রান্ত বিষয়গুলো ইসলামি আকিদা ও উসুলুদ দ্বীনের কিতাবে দেখতে পাই। ফিকহের কিতাবেও এর বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায়। এ ছাড়াও রাষ্ট্রীয় সংবিধান, প্রশাসন, অর্থনীতি ও রাজনীতি নিয়ে আলাদা আলাদা বিশেষায়িত অসংখ্য কিতাবাদি পাওয়া যায়। যেমন– আল মাওয়ারদির *আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, আবু ইয়ালার *আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, ইমামুল হারাইমাইনের *আল গিয়াসি*, ইবনে তাইমিয়ার *সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ*, ইবনে জামায়াহর *তাহরিরুল আহকাম*, ইমাম আবু ইউসুফের *আল-খারাজ*, ইয়াহইয়া ইবনে আদমের *আল-খারাজ*, আবু উবাইদের *আল-আমওয়াল*, ইবনে যানজুয়াহর *আল-আমওয়াল*– এরকম আরও অজস্র বইপুস্তক। এর সবগুলোই রচিত হয়েছে প্রশাসক ও বিচারকদের দায়িত্বের ধরন, প্রকৃতি, বিচারিক ও প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি, দায়িত্ব প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে।

ইসলামের ইতিহাস থেকে দলিল

ইসলামের ইতিহাস জানাচ্ছে– ঐশী হিদায়াতের ধারক এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূল সা. তাঁর শক্তি, চিন্তা ও সামর্থ্যের বড়ো অংশ বিনিয়োগ করেছেন, যা হবে দাওয়াতের ভূখণ্ড এবং তাঁর পরিবার ও অনুসারীদের একান্ত জায়গা। যে রাষ্ট্রে শরিয়াহর কর্তৃত্ব ছাড়া অন্য কারও কর্তৃত্ব থাকবে না। এজন্য রাসূল সা. বিভিন্ন গোত্রের কাছে গিয়েছেন। রাসূল সা. চেয়েছেন, তারা ঈমান আনুক এবং তাকে ও তাঁর দাওয়াহকে সুরক্ষা দিক। এই প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তায়ালা আউস ও খাযরাজদের কবুল করেন। তাদের মাঝে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে।

www.bjilibrary.com

আউস ও খাযরাজদের ৭৩ জন পুরুষ এবং ২ জন নারী হজের মৌসুমে রাসূল সা.-এর কাছে আগমন করেন এবং বাইয়াত গ্রহণ করেন। সেইসাথে তারা অঙ্গীকার করেন– তারা নিজেদের এবং নিজ পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের যেভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রাণান্তকর চেষ্টা করেন, ঠিক তেমনি আল্লাহর রাসূলকেও নিরাপত্তা প্রদান করবেন। এরপর আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা শ্রবণ, আনুগত্য, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধার ওপর বাইয়াত গ্রহণ করলেন।

রাসূল সা.-এর মদিনায় হিজরত একটি অনন্য ইসলামি সমাজ গড়ার প্রয়োজনেই হয়েছিল, যে সমাজের ওপর গড়ে উঠবে একটি অনুপম রাষ্ট্র। মদিনা ছিল একটি দারুল ইসলাম, একটি নতুন ধারার রাষ্ট্রের নমুনা– যার রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন স্বয়ং রাসূল সা.। তিনি ছিলেন একাধারে ইমাম ও নেতা, ছিলেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

আল্লাহর রাসূলের প্রতিষ্ঠিত সেই রাষ্ট্রে যোগদান করা, রাসূল সা.-এর শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে কাজ করা, সে রাষ্ট্রের ছায়ায় জীবনযাপন করা, সে রাষ্ট্রের সেনাপতিদের অধীনে জিহাদ করা– সে সময়ের সব ঈমানদারের ওপর ছিল ফরজ। ইসলামের শত্রুদের ও কুফরের ভূমি থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করা, সারা দুনিয়া থেকে মুমিন মুজাহিদদের দলে যোগদান করা এবং তাদের মতো চরিত্রকে ধারণ করা ছাড়া দ্বীনে পূর্ণতা আসত না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ... ﴿٧٢﴾

"যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের (মুসলিমদের) নেই।" সূরা আনফাল : ৭২

... فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ... ﴿٨٩﴾

"আল্লাহর পথে হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের কাউকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।" সূরা নিসা : ৮৯[৩১]

---

৩১. মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে হিজরত, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে এমন মুসলিম জামায়াতের সাথে যুক্ত থাকা– সকল মুসলিমের ওপর তার সাধ্যের আলোকে ফরজ।

www.bjilibrary.com

কিছু মুসলিম স্বেচ্ছায় দারুল হারব ও দারুল কুফরে বসবাস করছিল এবং এর ফলে তারা দ্বীনের নির্দেশনা, একান্ত করণীয় বিষয়াদি এবং আনুষ্ঠানিক ইবাদতগুলো স্বচ্ছন্দে ও যথাযথভাবে পালন করতে পারছিল না। আল্লাহ তায়ালা সেসকল মুসলিমদের কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করে বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾

"যারা নিজেদের ওপর জুলুম করে তাদের প্রাণ কবজ করার সময় ফেরেশতাগণ বলেন– তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে– 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম।' প্রত্যুত্তরে ফেরেশতাগণ বলেন– 'আল্লাহর জমিন কি এমন প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে পারতে?' এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত মন্দ আবাস! তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোনো পথও পায় না আল্লাহ অচিরেই তাদের পাপ মোচন করবেন। কারণ, আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, ক্ষমাশীল।" সূরা নিসা : ৯৭-৯৯

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সা.-এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কিরাম সর্বপ্রথম নিজেদের নেতৃত্ব নির্ধারণে ব্যস্ত হয়েছেন। এ কাজটা সাহাবাগণ রাসূল সা.-এর দাফনের পূর্বেই সম্পন্ন করেছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম যথাসম্ভব দ্রুত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর হাতে বাইয়াত নেন এবং তাঁর কাছে সকল দায়দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। এরপর প্রত্যেক যুগেই একই পরিস্থিতিতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সাহাবি ও তাবিয়িগণের ঐতিহাসিক এই ইজমাকে পরবর্তী আলিমগণ ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতীক এবং ইমামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ ওয়াজিব হওয়ার দলিল হিসেবে গণ্য করেছেন।

বর্তমান সময়ে ধর্মনিরপেক্ষতা দৃশ্যপটে আসার পূর্বে মুসলিমরা কখনও নিজেদের দ্বীন ও রাষ্ট্রকে আলাদাভাবে দেখেনি। সাম্প্রতিককালে দ্বীন ও রাষ্ট্রকে

www.bjilibrary.com

আলাদা করার প্রবণতা সম্পর্কে রাসূল সা. পূর্বেই আমাদের সতর্ক করেছেন এবং এই প্রবণতার বিরোধিতা করতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। যেমন, মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বর্ণিত হাদিস, তিনি বলেন–

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار. ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب. ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم إن عصيتموهم قتلوكم وإن أطعتموهم أضلوكم. قالوا: يا رسول الله كيف نصنع؟ قال: كما صنع أصحاب عيسى ابن مريم نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب. موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله.

"আমি রাসূল সা.-কে বলতে শুনেছি– 'সাবধান! ইসলামের চাকা একটি বৃত্তে ঘুরছে। সুতরাং তোমরা ইসলামের সাথে ঘুরতে থাকো। সাবধান! কুরআন ও সুলতান অচিরেই আলাদা হয়ে যাবে (অর্থাৎ, দ্বীন ও রাষ্ট্র)। সুতরাং তোমরা কিতাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। সাবধান! অচিরেই তোমাদের মাঝে কিছু শাসকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা নিজেদের জন্য যা ফয়সালা করবে, তোমাদের জন্য তা করবে না। যদি তোমরা তাদের অবাধ্য হও, তারা তোমাদের হত্যা করবে। আর যদি তাদের আনুগত্য করো, তবে তোমাদের পথভ্রষ্ট করবে।' সাহাবিগণ প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, তখন আমরা কী করব?' রাসূল সা. বললেন, 'ঠিক ঈসা ইবনে মারইয়ামের অনুসারীরা যা করেছে, তোমরা তা-ই করবে। তাদের করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে, শুলে চড়ানো হয়েছে। আল্লাহর আনুগত্যের মাঝে মৃত্যু, আল্লাহর অবাধ্যতার মাঝে বাঁচার চেয়ে উত্তম'।"[৩২]

---

৩২. ইসহাক ইবনে রাহুওয়াইহ তাঁর মুসনাদে হাদিসটি সুয়াইদ ইবনে আবদুল আযিয থেকে বর্ণনা করেছেন; আর তা জয়িফ। আহমাদ ইবনে মুনি হাদিসটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আল বুসিরি তাঁর 'আল ইতহাফ'-এ এমনটিই বলেছেন। দেখুন, ইবনে হাজারের *আল মাতালিবুল আলিয়াহ*, তাহকিক : শাইখ হাবিবুর রহমান আল আযমি, কুয়েত ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সংস্করণ : ৪৪০৮/৪। তাবারানিও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, অবশ্য সে সূত্রে রাবি ইয়াযিদ ইবনে মারসাদ মুয়াজ রা. থেকে শোনেননি। ইবনে হিব্বান সহ অনেকেই তাকে সিকাহ বলেছেন এবং একদল হাদিসবিশারদ তাকে জয়িফ বলেছেন। এ সনদে অন্যান্য সকল রাবিগণ সিকাহ (নির্ভরযোগ্য)। দেখুন, আল হাইসামির 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' : ২৩৮/৫

www.bjilibrary.com

ইসলামের ভাবধারা থেকে দলিল

ইসলাম ও ইসলামের রিসালার প্রকৃতি হলো– এটি সর্বজনীন দ্বীন, সার্বজনীন শরিয়াহ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই শরিয়াহ জীবনের সকল দিকে মনোনিবেশ করে। সুতরাং, রাষ্ট্রীয় দিককে ইসলাম অবহেলা করবে– এ কথা চিন্তাতীত। রাষ্ট্রকে অসৎ, নাস্তিক ও পাপীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া ইসলামের বৈশিষ্ট্যের সাথে মানানসই নয়। এটা তো অকল্পনীয় যে– রাষ্ট্রকে অসৎ লোকেরা চালাবে, আর ইসলামি শরিয়াহ শুধু আকিদা ও ইবাদত নিয়ে নির্দেশনা দেবে।

এই দ্বীন শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতার দিকে আহ্বান করে এবং যেকোনো ক্ষেত্রে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা অপছন্দ করে। এমনকি রাসূল সা. আমাদের সালাতের কাতার সোজা করতে এবং অধিক জ্ঞানীকে ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছেন। আরও নির্দেশ দিয়েছেন– সফরের সময়ও কাউকে দায়িত্বশীল বানিয়ে নিতে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর السياسة الشرعية গ্রন্থে বলেন–

> "এটা জানা জরুরি যে, মানবীয় প্রয়োজন বা জাগতিক বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা দ্বীনের সবচেয়ে বড়ো ওয়াজিব। এটি ছাড়া দ্বীন ও দুনিয়া কোনোটারই অস্তিত্ব নেই। সমাজ ও সামষ্টিকতা ছাড়া আদম সন্তানদের চাহিদাসমূহ পূরণ করা সম্ভব নয়। কারণ, মানুষ একে অপরের মুখাপেক্ষী। আর সমাজ ও সামষ্টিকতার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব অপরিহার্য। সেজন্যই আল্লাহর রাসূল সা. বলেছেন–
>
> إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ .
>
> "তোমাদের তিনজন যদি সফরে বের হও, তবে একজনকে আমির হিসেবে নিযুক্ত করো।"[৩৩]
>
> ইবনে উমর রা.-এর সূত্রে ইমাম আহমাদের বর্ণনা, নবি সা. বলেছেন–
>
> لا يحل لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض إلا أمّروا عليهم أحدهم .
>
> "তোমাদের তিনজন যদি নির্জন কোনো মেরুতেও থাকো, একজনকে নেতা নিযুক্ত না করা জায়েয হবে না।"

---

৩৩. তাবারানি হাদিসটি আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণনা করেন। *মাজমাউয যাওয়ায়িদ*-এ এসেছে– এ হাদিসের রাবিগণ বিশ্বস্ত : ২৪৯/৫। (আবু সাঈদ খুদরি ও আবু হুরায়রা রা. থেকেও একই শব্দাবলি সংবলিত হাদিস বর্ণিত হয়েছে; আবু দাউদ : ২৬০০)।

www.bjilibrary.com

আমরা জানি, নবি সা. সফরের ছোটো কাফেলায়ও নেতৃত্ব বাধ্যতামূলক করেছেন। আসলে রাসূল সা. সকল সামাজিক প্রেক্ষাপটে নেতৃত্ব সম্পর্কে সতর্ক করতে চেয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধাদানকে ওয়াজিব করেছেন। এ কাজ দুটো শক্তি ও নেতৃত্ব ছাড়া যথার্থভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়।

এভাবে মহান আল্লাহ তায়ালা এমন অনেক কিছু আমাদের ওপর আবশ্যক করেছেন, যা ক্ষমতা ও নেতৃত্ব ছাড়া যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা অসম্ভব; যেমন– জিহাদ, ন্যায়বিচার, হজ, জুমা, ঈদ, মজলুমের সাহায্য, শরয়ি দণ্ড বাস্তবায়ন ইত্যাদি। এ কারণে বলা হয়– 'সুলতান (শাসনক্ষমতা) পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া।' এসব বাস্তবতা ও জরুরতের কারণেই সালফে সালিহিনের অনেকে যেমন– ফাদল ইবনে ইয়াজ, আহমাদ ইবনে হাম্বলসহ অনেকে বলতেন– 'যদি আমাদের ইচ্ছাপূরণের সুযোগ থাকত, তবে আমরা শাসনক্ষমতা চাইতাম'।"[৩৪]

ইমামদের এমন আকাঙ্ক্ষার কারণ হলো– শাসনক্ষমতার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বহু সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করেন।

একটি জীবনধারা হিসেবে ইসলাম মানবজীবনকে নিবিড়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, সমাজকে শাসন করতে চায় এবং আল্লাহর আদেশের আলোকে মানবচরিত্রকে সাজাতে চায়। বক্তৃতা-বিবৃতি কিংবা সুন্দর সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে মানবচরিত্রের পূর্ণতা সাধন সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে ইসলামের বিধিবিধান, নসিহত ও শিক্ষা শুধু মানুষের বিবেকের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। কারণ, বিবেকের অসুস্থতা বা মৃত্যুর সাথে এই সকল বিধানের বাস্তবায়নের অনুভূতি ও শিক্ষা দুর্বল হয়ে পড়ে।

আমিরুল মুমিনিন উসমান ইবনে আফফান রা. বলেন–

إن الله ليَزَعُ بالسلطان ما لا يَزَعُ بالقرآن.

"কিছু কাজ আল্লাহ তায়ালা সুলতানের (রাষ্ট্রশক্তি) হাত দিয়ে করান– যা কেবল কুরআনের (উপদেশের) মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় না।"

---

৩৪. *আস সিয়াসাতুশ শারয়িয়্যাহ, মাজমুয়ু ফাতাওয়া শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়া* : ৩৯০,৩৯১/২৮

www.bjilibrary.com

কিছু মানুষকে কুরআন ও মিজান সুপথ দেখায়, আর কিছু মানুষকে সুপথে রাখতে পারে কেবল আইন ও লোহা (শাস্তির ভয়)। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ...﴿٢٥﴾

"নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদের প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও মিযান– যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে; আর আমি লৌহ দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ।" সূরা হাদিদ : ২৫

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন–

"যে কিতাব থেকে সরে যাবে, তাকে লোহা (শক্তি) প্রয়োগ করে ঠিক করা হবে। আর এ কারণেই দ্বীনের তত্ত্বাবধায়করা কুরআন ও তরবারির সমন্বয়ে কাজ করেছেন।"[৩৫]

ইমাম গাযালি রহ. বলেন–

"দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। দুনিয়া ছাড়া দ্বীন পূর্ণতা পায় না। রাষ্ট্র ও দ্বীন জমজ ভাই। দ্বীন মৌলিক স্তম্ভ, আর শাসক তার রক্ষক। যার মৌলিকত্ব নেই, তার অস্তিত্বই নেই। আর যার রক্ষক নেই, তার ধ্বংস অনিবার্য। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের পরিচালনা শাসক ছাড়া পূর্ণতা পায় না।"[৩৬]

ইসলামি জ্ঞানের উৎসগুলোতে যদি ইসলামি রাষ্ট্রের আবশ্যকতার কথা নাও আসত, যদি রাসূল সা. ও সাহাবিগণ এর বাস্তবায়ন করে নাও দেখাতেন, তারপরও ইসলামের স্বভাবজাত প্রকৃতি নিজ প্রয়োজনেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে বাধ্যতামূলক করে দিত। আর তা হতো ইসলামের বিশ্বাস, প্রতীক, শিক্ষা, বোধ, চারিত্রিক গুণাবলি, নিয়মনীতি ও শরিয়তের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

ইসলামের দাবি বাস্তবায়নে প্রতিটি যুগেই রাষ্ট্রের চাহিদা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে এর চাহিদা আরও তীব্রতর। কেননা, এখন চিন্তা ও দর্শনভিত্তিক আদর্শিক রাষ্ট্রের প্রবর্তন হয়েছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, আইন, বিচার,

---

৩৫. *মাজমুয়ুল ফাতাওয়া* : ২৬৪/২৮

৩৬. *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*, কিতাবুল ইলম : ৭১/১

www.bjilibrary.com

অর্থনীতি থেকে শুরু করে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রাজনীতি সবই এই আদর্শের মানদণ্ডে চলে। উদাহরণত আমরা সমাজতান্ত্রিক ও কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি।

আধুনিক বিজ্ঞান এখন উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করছে। রাষ্ট্র চাইলে প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমাজের চিন্তা, বিশ্বাস, আবেগ-অনুভূতি, রুচি, চরিত্র ইত্যাদির ওপর কার্যকর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। এমন সুযোগ পূর্বের কোনো সময় ছিল না। রাষ্ট্র এখন ওপরে বসে যন্ত্র ব্যবহার করে সমাজের মূল্যবোধ, চিন্তার গণ্ডি ও চরিত্রকে পরিবর্তন করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। এ কাজে রাষ্ট্রের শক্তিশালী কোনো প্রতিপক্ষও নেই।

ইসলামি রাষ্ট্র একটি আদর্শিক রাষ্ট্র। এটি একটি বিশ্বাস এবং জীবনধারার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এটি শুধু অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রু থেকে জাতিকে রক্ষার কোনো নিরাপত্তাযন্ত্র নয়; বরং এ রাষ্ট্রের দায়িত্বসীমা অনেক বিস্তৃত ও গভীর। জাতিকে ইসলামের বুনিয়াদ ও শিক্ষার আলোকে শিক্ষিত ও অনুশীলনকারী হিসেবে গড়ে তোলা– এই রাষ্ট্রের আবশ্যিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ইসলামি আকিদা, চিন্তা ও শিক্ষার বিকাশ এবং বাস্তব জীবনে এর অনুশীলনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা হবে প্রত্যেক সত্যনিষ্ঠের জন্য অনুকরণীয় এবং বিপথগামীর বিপক্ষে উদাহরণ।

এজন্যই ইবনে খালদুন খিলাফতের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে–

> "শরিয়তপ্রণেতার কাছে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনার পুরোটাই আখিরাতের কল্যাণের জন্য বিবেচ্য। সুতরাং, সমগ্র মানবতাকে পরকালীন ও দুনিয়াবি কল্যাণের বিবেচনায় শরয়ি দর্শনের দিকে উদ্‌বুদ্ধ করা এবং দ্বীন ও তৎসংশ্লিষ্ট দুনিয়ার রাজনীতি রক্ষণাবেক্ষণে শরিয়তপ্রণেতার প্রতিনিধিত্ব করাই খিলাফত।"[৩৭]

আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের প্রশংসায় এমন গুণাবলি বর্ণনা করেছেন, যা রাষ্ট্র ও কর্তৃত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ...﴿٤١﴾

---

৩৭. *মুকাদ্দামাতু ইবনে খালদুন* : ৫১৮/২, লাজনাতুল বায়ান আল আরাবির সংস্করণ; তাহকিক : ড. আলি আবদুল ওয়াহিদ ওয়াফি।

www.bjilibrary.com

"আমি তাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজ হতে বিরত করবে।" সূরা হজ : ৪১

রিবয়ি ইবনে আমির রা. পারসিকদের সেনাপতি রুস্তমকে ইসলামি রাষ্ট্রের নির্দশন নিয়ে বলেছিলেন–

الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.

"আল্লাহ তায়ালা আমাদের পাঠিয়েছেন মানুষকে বান্দার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে আখিরাতের প্রাচুর্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অন্যান্য ধর্মের অত্যাচার-অনাচার থেকে ইসলামের সুবিচারের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।"[৩৮]

ইসলামের আদর্শিক রাষ্ট্র কোনো আঞ্চলিক বা জাতীয়তাবাদী চরিত্রের রাষ্ট্র নয়; বরং এ রাষ্ট্র একটি বৈশ্বিক বার্তার বাহক। কারণ, আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন– তাদের কাছে থাকা আলো ও হিদায়াতের দিকে গোটা মানবতাকে আহ্বান জানানোর। তাদের দায়িত্ব দিয়েছেন মানবতার ওপর সাক্ষী হওয়ার। পুরো মানবজাতির শিক্ষকতার দায়িত্বও তাদের ওপর অর্পিত।

মুসলিমরা অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর মতো ইতিহাসের গতিধারায় গড়ে উঠা কোনো জাতি নয়। মুসলিমরা নিজ থেকে তৈরি হয়নি এবং নিজেদের জন্যও তৈরি হয়নি। মূলত মানবজাতির কল্যাণের জন্য মুসলিমদের বের করে নিয়ে আসা হয়েছে। আর এজন্য আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের বানিয়েছেন মধ্যপন্থি জাতি। মহান আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের উদ্দেশে বলেছেন–

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ... ﴿١٤٣﴾

"আমি এভাবে তোমাদের মধ্যপন্থি উম্মাহ করেছি, যেন তোমরা মানবতার জন্য সাক্ষী হও।" সূরা বাকারা: ১৪৩

---

৩৮. তাবারি تاريخ الرسل والملوك গ্রন্থে এবং ইবনে কাসির البداية والنهاية গ্রন্থে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

www.bjilibrary.com

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ...﴿١١٠﴾

"তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, যাদেরকে মানবতার জন্য বের করা হয়েছে।" সূরা আলে ইমরান : ১১০

আমরা ইতিহাসে পাতা উলটালে দেখতে পাই, হুদাইবিয়ার সন্ধির পর প্রথম সুযোগেই রাসূল সা. তৎকালীন দুনিয়ার উল্লেখযোগ্য সকল রাজা-বাদশাহ ও আমিরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানিয়ে চিঠি লিখেছেন। তাওহিদের কাছে সমর্পণ করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন– 'ঈমানের পথ গ্রহণ না করলে নিজেদের ও অধীনস্থদের পাপের ভার বইতে হবে।' রাসূল সা. এ চিঠিগুলোর সমাপ্তি টানতেন এ আয়াতের মাধ্যমে–

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

"আপনি বলে দিন– 'হে আহলে কিতাব, তোমরা এমন এক কালিমার দিকে এসো, যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমান। আর তা হলো– আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করব না এবং আল্লাহ ছাড়া আমাদের কেউ অপর কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না।' এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলে দিন– 'তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলিম'।" সূরা আলে ইমরান : ৬৪

ইসলামের ধারক একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান সময়ে ইসলামি দাওয়াহর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো, ছোটো পরিসরে হলেও একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এই রাষ্ট্রটি তার ধ্যান-ধারণা, সরকারব্যবস্থা, জীবনাচার, সভ্যতা, বস্তুগত দিক ও সাহিত্যে ইসলামের সামগ্রিক ধারণাকে লালন করবে। এই রাষ্ট্রের দরজা খোলা থাকবে জুলুম, বিদআত ও কুফরের দেশ থেকে হিজরতকারী মুমিনদের জন্য। শুধু ইসলামের জন্য নয়, গোটা মানবতার জন্যই এমন একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজন। এই ইসলামি রাষ্ট্রটি মানবতার সামনে দ্বীন ও দুনিয়ার সমন্বয়ের নমুনা পেশ করবে।

www.bjilibrary.com

উদাহরণ পেশ করবে পার্থিবতা ও আধ্যাত্মিকতার সুষম ভারসাম্যের। এ রাষ্ট্র হবে যুগপৎভাবে সভ্যতার উন্নতির ও চরিত্রের উৎকর্ষতার নজির, হবে বৃহত্তর ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পথে একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ। এই ইসলামি রাষ্ট্রই গোটা উম্মাহকে পর্যায়ক্রমে ইসলামি খিলাফতের ছায়ায় একই তোরণের নিচে নিয়ে আসবে।

বাস্তবতা হচ্ছে– সকল বিরোধী শক্তিগুলো এখাট্টা হয়ে এমন একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্মুখে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা কোনোমতেই এমন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হতে দেওয়াকে বরদাশত করবে না। এই রাষ্ট্রকে ঠেকাতে তারা নিজেদের সর্বশক্তি ব্যয় করবে– এ রাষ্ট্রটি যত কম দৈর্ঘ্য বা জনসংখ্যারই হোক না কেন। এমনকি পশ্চিমারা মার্কসীয় রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব করে। কমিউনিস্টরা গণতন্ত্রীদের সাথে সন্ধি করে। কিন্তু তাদের কেউই ইসলামি রাষ্ট্রকে বরদাশত করতে রাজি নয়।

বিশ্বের কোথাও ইসলামি আন্দোলন দাঁড়িয়ে গেলে পশ্চিমারা একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। সাথে সাথে হুমড়ি খেয়ে পড়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক কুফরি শক্তিগুলো। তারা সুন্দর সুন্দর কথা বলে। ছলনা দেখায়। আবার খাদ্য অবরোধও করে। নির্যাতনের স্টিমরোলার চালায়। হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। একটার পর একটা হামলা চালাতেই থাকে। তাই ইসলামি আন্দোলনগুলোকে সর্বদা বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে আশার আলো দেখতে হয়। এক সাগর হতাশা ও আঘাতকে সহ্য করে কাঙ্ক্ষিত উচ্চাশার সোপানের দিকে এগিয়ে চলতে হয়।

আমাদের যদি একটা সরকার থাকত

ইমাম হাসান আল বান্না বলেন–

"আমাদের যদি বিশুদ্ধ ইসলাম, প্রকৃত ঈমান, বিশুদ্ধ চিন্তার ধারক এবং এর বাস্তবায়নকারী একটি সরকার থাকত! যে সরকার তাদের কাছে সঞ্চিত সম্পদ ও জ্ঞানের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন, ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার ঐতিহ্য ও মহত্ত্ব সম্পর্কে সমঝদার এবং যারা বিশ্বাস করে– উম্মাহর সকল ব্যাধির সমাধান ও মানবজাতির পথপ্রাপ্তি ইসলামেই রয়েছে। তাহলে আমরা গোটা দুনিয়াকে ইসলামের খুঁটিতে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানাতে পারতাম। অন্য রাষ্ট্রগুলোকে আহ্বান জানাতে পারতাম– আমাদের রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থার ওপর গবেষণা আর পর্যবেক্ষণের। তাদের মাঝে নিয়মিত দাওয়াতি কার্যক্রম,

www.bjilibrary.com

সৌহার্দ্য বিনিময় এবং প্রতিনিধি দল প্রেরণের মাধ্যমে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে পারতাম। অন্যান্য সরকারের তুলনায় এটা হতো আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক কার্যকারিতার সমন্বয়। এর মাধ্যমে জাতি প্রাণশক্তি নবায়নের এবং গৌরব ও আলোকশক্তি রক্ষার সুযোগ পেত। সেইসাথে নাগরিকদের হৃদয়ে উদ্যম ও কর্মস্পৃহা জাগত এবং তাদের কার্যশক্তি প্রভাবিত হতো।

মজার ব্যাপার হলো, সমাজতন্ত্রীরা নিজেদের মতবাদের গুণকীর্তন প্রচার করে। অর্থ খরচ করে নিজ আদর্শের দিকে ডাকে। নিজেদের পথচলায় তারা জনতাকে পাশে চায়– যেন তাদের পথ উদ্দীপনাময় ও দাপুটে হয়। সমাজন্ত্রীরা অনুসারীদের উদ্দীপনার খোরাক জোগাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। তারা চায়, সকল রাষ্ট্রব্যবস্থা তাদের সামনে নুয়ে পড়ুক।

সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদগুলোর কিছু পাগলপ্রাণ সমর্থক থাকে। তারা নিজেদের ধ্যান, জ্ঞান, চিন্তা, লেখনীশক্তি, সম্পদ, প্রচারমাধ্যম সবকিছু এ মতবাদের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার পেছনে ব্যয় করে, যেন এ মতবাদকে কেন্দ্র করেই তাদের বাঁচা-মরা আবর্তিত হচ্ছে।

আমাদের সামনে ইসলামের দিকে আহ্বানকারী এমন কোনো রাষ্ট্রের উপস্থিতি নেই– যে রাষ্ট্রটি ইসলামের সৌন্দর্যসমূহ একত্রিত করে নিষ্কলুষ ও অবিকৃত ইসলামকে একটি আন্তর্জাতিক নীতি হিসেবে উপস্থাপন করবে এবং যার মাধ্যমে মানবতার সকল সমস্যার সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাধান সম্ভব হবে।

মুসলিমদের ওপর দাওয়াতি কাজ ফরজ। এটা যেমন ব্যক্তিপর্যায়ে ফরজ, ঠিক তেমনি সামষ্টিক পর্যায়েও ফরজ। অর্থাৎ, জাতিগতভাবে মুসলিমদের ওপর দাওয়াতি কাজ ফরজ। কোনো ইসলামি রাষ্ট্র গড়ে উঠার পূর্বেও দাওয়াতি কাজ ফরজ। রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার পর এ কাজটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই, যারা কল্যাণের দিকে মানুষকে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। তারাই হবে সফলকাম।" সূরা আলে ইমরান : ১০৪

www.bjilibrary.com

আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানদের অবস্থা কী? আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রায় সকলেই বিজাতীয় শিক্ষায় বড়ো হয়েছে। তারা আধিপত্যবাদীদের চিন্তার অনুগত এবং তাদের চিন্তার বৃত্তেই ঘূর্ণায়মান। আধিপত্যবাদীদের সন্তুষ্টি ছাড়া আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানরা নিশ্বাসও নিচ্ছে না।

আমরা তাদের বলেছি এবং বলছি– আপনারা স্বাধীনচেতা সিদ্ধান্ত নিন এবং আধিপত্যবাদীদের অনুকরণ ছেড়ে বেরিয়ে আসুন। এটা আপনাদের অবস্থান দুর্বল করবে না; বরং শক্তিশালী করবে। আফসোস! আমাদের কথাগুলো তাদের কর্নকুহরে প্রবেশ করে না।

আমরা বড়ো আশা-ভরসা নিয়ে মিশরের শাসকের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলাম। দুর্ভাগ্য! এই দাওয়াতের কোনো কার্যকর প্রভাব তৎকালীন শাসকের মাঝে পরিলক্ষিত হয়নি। যে জাতি নিজের অস্তিত্ব, বাসস্থান, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইসলাম খুইয়ে বসেছে, তারা কীভাবে অন্যের কাছে ইসলাম পৌঁছে দেবে? সে জাতি তো অন্যকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

প্রিয় ভাইয়েরা! বর্তমানে মুসলিম জাতি দাওয়াতি দায়িত্ব পালন করছে না। আর দাওয়াতি কাজে মনোনিবেশ না করার কারণ কী জানেন? কারণ, বর্তমান প্রজন্মের দাওয়াতি কাজে উৎসাহ ও অক্ষমতা প্রমাণিত। সুতরাং, এ দায়িত্ব নিতে হবে নতুন প্রজন্মকে।

প্রিয় তরুণ ভাইয়েরা! তোমাদের দাওয়াতি তৎপরতায় সৃজনশীলতা আনো। দাওয়াতি কাজে পরিশ্রম করো। মানুষকে নাফস ও কলবের মুক্তি শেখাও। চিন্তা ও বুদ্ধির প্রকৃত স্বাধীনতা বাতলে দাও। জিহাদ ও কর্মে স্বাধীন করে তোল। কুরআন ও ইসলামের প্রাচুর্যে সাধারণ মানুষের দ্বিধাগ্রস্ত মনকে ভরিয়ে দাও। তাদের মুহাম্মাদি ফৌজে শামিল করে নাও। অচিরেই দেখবে, তাদের মধ্য থেকে কেউ না কেউ মুসলিম শাসক হয়ে অবির্ভূত হয়েছে। আর সেই শাসক নিজেও জিহাদ করবে, অন্যদেরও জিহাদে উৎসাহ জোগাবে।"[৩৯]

*****

৩৯. *মাজমুয়ু রাসায়িলিল ইমাম আশ শাহিদ*, পৃষ্ঠা : ১৯৬, ১৯৭

www.bjilibrary.com

ইসলাম ও রাজনীতি

ইসলামের ব্যাপকতাকে ধূলির আস্তরণ সরিয়ে মানুষের সামনে পুনরায় উদ্ভাসিত করতে ইমাম হাসান আল বান্নাকে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করতে হয়েছে। তেরো শত বছর ধরে ইসলাম যা ছিল– সেদিকে মুসলিমদের আবার ফিরিয়ে আনতে তিনি সর্বাত্মক পরিশ্রম করেছেন।

ইসলামি আইন ও পথনির্দেশ সমগ্র মানবজীবনকে শামিল করে। শুধু জন্ম থেকে মৃত্যু নয়; জন্মের পূর্বের এবং মৃত্যু পরবর্তী বিষয়ও ইসলামি আইনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন– ইসলামে ভ্রূণ সংক্রান্ত কিছু বিধানও রয়েছে। এমনকি মানুষ মারা যাওয়ার পরও বেশ কিছু বিধান রয়েছে।

ইসলাম মুসলিমদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকল বিষয়ে পথনির্দেশনা দেয়। শৌচকর্মের শিষ্টাচার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা কিংবা যুদ্ধ, সন্ধি– সবক্ষেত্রেই ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে।

ইমাম হাসান আল বান্নার এ প্রচেষ্টার ফলাফল আজ স্পষ্ট। আজ প্রত্যেকটি মুসলিম ভূখণ্ডে এমন বিশাল সংখ্যক মানুষ আছে– যারা ইসলামের ব্যাপকতায় বিশ্বাস করে। তারা আকিদা, শরিয়াহ, দ্বীন ও রাষ্ট্রভিত্তিক ইসলামের দিকে আহ্বান করে। ঔপনিবেশিকদের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের বলি হওয়া একটি বড়ো অংশও আজ ইসলামের দিকে ফিরে এসেছে। তারা ঔপনিবেশিকদের চাপিয়ে দেওয়া চিন্তার বিভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে আসছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গোয়েন্দাদের উদ্ভাবিত মানদণ্ড ছেড়ে মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলামি জাগরণের বিকাশ ঘটছে। এই গোয়েন্দারা ইসলামের ভীতিকর রূপ তৈরি করতে অসংখ্য সভা, সেমিনার ও সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। তারা প্রচুর পরিমাণে অর্থও বিনিয়োগ করত। উসতাজ ফাহমি হুয়াইদির মতে, সে সময় শত্রুগোয়েন্দাদের দ্বারা পরিচালিত সংগঠন ছিল ১২০টির মতো।

www.bjilibrary.com

পাশ্চাত্য-চিন্তার দাসরা সুবহে সাদিককে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত। আটকে দেওয়ার চেষ্টা করত সূর্যোদয়কে। তারা চেষ্টা করত ইতিহাসের চাকাকে ঔপনিবেশিক যুগে নিয়ে থামানোর। পাশ্চত্যপন্থিরা জোর গলায় বলতে চায়– 'ধর্মে কোনো রাজনীতি নেই আর রাজনীতিতে কোনো ধর্ম নেই।'

পাশ্চাত্যবাদীরা জোরপূর্বক ঔপনিবেশিক সময়টি ফিরিয়ে আনতে চায়। অথচ তা আমরা অর্ধশতাব্দী পূর্বেই পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে এসেছি। পাশ্চাত্যপন্থি বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ বহুদিন ধরে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপকে 'রাজনৈতিক ইসলাম' বলে সংজ্ঞায়িত করছে। অথচ সকল মাযহাবের ফকিহ, উসুলবিদ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও মুতাকাল্লিমগণ ইসলামকে পবিত্রতা অর্জনের অধ্যায় থেকে শুরু করে জিহাদের অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহকারে সংজ্ঞায়িত করেছেন। কুরআন-সুন্নাহর ইসলামকে পাশ্চাত্যবাদীরা 'রাজনৈতিক ইসলাম' নাম দিতে চাচ্ছে।[৪০]

এসকল শেকড়হীন বুদ্ধিজীবীরা চায় যে, মানুষ ইসলামকে ঘৃণা করুক! কারণ, এ অঞ্চলের মানুষ প্রচলিত রাজনীতিকে ঘৃণা করে। কেননা, ঔপনিবেশিকদের চাপিয়ে দেওয়া রাজনীতি তাদের ওপর অনেক দুর্যোগ নিয়ে এসেছিল এবং বহুভাবে ভুগিয়েছিল। রাজনীতির প্রতি জনগণের এই ঘৃণাকে পাশ্চাত্যপন্থিরা ইসলামের পুনর্জাগরণের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে চায়।

আল্লাহপ্রদত্ত ইসলাম যখন রাজনৈতিক, তখন আমরা এ বিষয়ে লুকোচুরি করব কেন? আল্লাহপ্রদত্ত ইসলাম জীবনকে আল্লাহ ও কায়সারের মাঝে ভাগ করাকে সমর্থন করে না। বরং এই ইসলাম স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেয় যে– কায়সার, কিসরা, ফিরাউন এবং পৃথিবীর রাজা-মহারাজা সবাই আল্লাহর গোলাম।

পাশ্চাত্যপন্থিরা চাচ্ছে– আমরা আল্লাহর কিতাব, নবি সা.-এর সুন্নাত, উম্মাহর ইজমা এবং আমাদের উত্তরাধিকার সত্যপথ ছেড়ে দিই। তারা চায়– সমুদ্রের ওপারের রাষ্ট্রনায়কদের সন্তুষ্ট করতে নতুন ইসলাম বানাতে! তারা আধ্যাত্মিক ইসলাম চায়। ব্রাহ্মণ্যবাদী ইসলাম চায়– যা মৃত ব্যক্তির ওপর কুরআন তিলাওয়াতেই সন্তুষ্ট থাকবে; জীবিতদের জন্য নয়। তারা চায়– ঘরের দেয়াল কুরআনের আয়াত দিয়ে কারুকার্যমণ্ডিত হবে, কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে

৪০. এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে আমার রচিত গ্রন্থ *ফাতাওয়া মুয়াসারার* দ্বিতীয় খণ্ডে, 'রাজনৈতিক ইসলাম' শিরোনামে।

www.bjilibrary.com

সকল অনুষ্ঠান শুরু হবে, কিন্তু বাদবাকি সব কায়সারের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে। বিচার কীভাবে চলবে, কোন কাজ কীভাবে হবে– সবই কায়সারের মর্জিতে নির্ধারিত হবে!

কুরআন-সুন্নাহর ইসলাম, আমাদের সালাফ ও পূর্বসূরিদের ইসলামই পরিপূর্ণ ইসলাম। এই ইসলাম জীবনের বিভক্তি ও দ্বীনের বিভাজন সহ্য করে না। রুহানি ইসলাম, আখলাকি ইসলাম, তাত্ত্বিক ইসলাম, তালিম-তারবিয়াতি ইসলাম, জিহাদি ইসলাম, সমাজ-অর্থনীতির ইসলাম, রাজনীতির ইসলাম– এভাবে ইসলামকে আলাদা করা যাবে না; বরং ইসলাম এ সবগুলোর সমষ্টি। এসবের প্রত্যেকটি অঙ্গনেই আছে ইসলামের বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; আছে বিধিবিধান ও নির্দেশনা।

এ প্রসঙ্গে ইমাম হাসান আল বান্না বলেন–

> "দ্বীন ও রাজনীতি নিয়ে কথা বলার সময় দুটোকে পৃথক করে দেখে না– এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। তারা দ্বীন ও রাজনীতি এ দুটোকে দুই প্রান্তে রাখে। এ কারণেই বলা হয়– 'এটি ইসলামি সংস্থা, রাজনীতির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই', 'এটি একটি রাজনীতিমুক্ত দ্বীনি সমাবেশ'। বহু দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রের শুরুতে লেখা হয় 'এটি একটি অরাজনৈতিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান'।
>
> এই তত্ত্বের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার দিকে যাওয়ার পূর্বে আমরা দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করতে চাই।
>
> **এক.** রাজনীতি ও সংগঠন পুরোপুরি একই জিনিস নয়; বরং এতদুভয়ের মাঝে আছে অনেক পার্থক্য এবং সেইসাথে আছে অনেক মিলও। আবার কিছু বিষয় স্পষ্টত ভিন্ন প্রকৃতির। একজন ব্যক্তি সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক হতে পারে; যদিও কোনো সংগঠনের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত লোকের অবস্থা এমনও হতে পারে, সে রাজনীতির কিছুই বোঝে না। আবার কেউ যুগপৎ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক হতে পারে। হতে পারে দলীয় রাজনীতিক বা রাজনৈতিক দলীয়। আমি যখন রাজনীতি নিয়ে কথা বলব, তখন সাধারণ রাজনীতি নিয়ে কথা বলব। দলীয় গণ্ডির ঊর্ধ্বে উঠে উম্মাহর অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির ওপর দৃষ্টিপাত করব।

www.bjilibrary.com

দুই. ইসলামের ব্যাপকতর ধারণা সম্পর্কে অজ্ঞ অমুসলিমরা যখন ইসলামের কোনো দিক নিয়ে হতাশ হয়েছে, যেমন– মুসলিমদের দৃঢ় মনোবল, জানমাল উৎসর্গ করার প্রবণতা, ছাড় না দেওয়ার মানসিকতা ইত্যাদি– তখন তারা ইসলামের নাম, বাহ্যিক রূপ ও সত্তার ওপর কথা বলে মুসলিমদের সরাসরি আঘাত না দিয়ে ইসলামকে নির্দিষ্ট কিছু কর্মের গণ্ডিতে সীমিত করতে চেয়েছে। তারা ইসলামের নাম, চেহারা ও বাহ্যিক দিকগুলো ছেড়ে দিয়েছে। কারণ, ইসলামের এ খণ্ডিত রূপ নিজেও পুষ্ট নয় এবং অন্যকেও পুষ্টির জোগান দিতে পারে না।

পাশ্চাত্যপন্থিরা মুসলিমদের বুঝিয়েছে– ইসলাম এক জিনিস, সমাজ অন্য জিনিস। ইসলাম এক বিষয়, আইন আরেক বিষয়। ইসলামের সাথে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের কোনো সম্পর্ক নেই। সাধারণ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ইসলামের সম্পূর্ণ বাইরের একটি বিষয়। ইসলামকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে হবে।

প্রিয় ভাইয়েরা! ইসলাম যদি হয় রাজনীতিবিহীন, সমাজ-অর্থনীতি-সংস্কৃতিমুক্ত কিছু, তাহলে ইসলাম আসলে কী? তবে কি ইসলাম কেবল নামাজের এই রাকাতগুলো? নাকি রাবিয়া আল আদাবিয়ার এই কথামালা– 'ইসতিগফারেরও ইসতিগফার দরকার'! আর কুরআন কি এ জন্যই পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে নাযিল হয়েছে?

...تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

> "আমি মুসলিমদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট বর্ণনা, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম।" সূরা নাহল : ৮৯

ইসলামি তত্ত্বের এই ক্ষুদ্রকরণ চেষ্টা এবং ইসলামকে সংকীর্ণ এই গণ্ডিতে সীমিতকরণ মূলত ইসলামের শত্রুদের দীর্ঘমেয়াদি চেষ্টার ফসল। তারা ইসলামকে একটি সীমিত গণ্ডিতে বাঁধতে চেয়েছিল। আর এ কথা বলে হাসাহাসি করতে চেয়েছিল– 'আমরা তো তোমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছি। তোমাদের সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম তো ইসলাম।'

প্রিয় ভাইয়েরা! আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে স্পষ্ট করে বলতে চাই, বিরোধী পক্ষগুলো এবং মুসলিম নামধারী ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে যে অর্থে ব্যবহার করতে চাচ্ছে– তা প্রকৃত ইসলাম নয়। তারা ইসলামকে

www.bjilibrary.com

সীমাবদ্ধ করতে চাচ্ছে। ইসলামের সাথে শর্ত লাগিয়ে দিতে চাচ্ছে। আকিদা ও ইবাদত, ভূখণ্ড ও জাতীয়তা, নম্রতা ও শক্তি প্রদর্শন, চরিত্র ও পার্থিবতা, সংস্কৃতি ও আইনের সমষ্টির নাম ইসলাম। একজন মুসলিম ইসলামের বিধিবিধান দ্বারা আদেশপ্রাপ্ত। উম্মাহর সকল বিষয় তাকে গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। যে ব্যক্তি মুসলিমদের বিষয়াদিতে গুরুত্ব দেয় না, সে মুসলিমদের দলভুক্ত নয়।

আমি নিশ্চিত, আমাদের পূর্ববর্তী প্রাথমিক যুগের মুসলিমরা ইসলামের এই ব্যাপকতর অর্থই বুঝেছেন। তারা ইসলামের নিয়মনীতি মেনেই বিচারকার্য, জিহাদ ও লেনদেন পরিচালনা করতেন। তারা সকল দুনিয়াবি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন ইসলামের গণ্ডির ভেতরে থেকেই এবং একইভাবেই আখিরাতমুখী কাজগুলোও করতেন।

প্রথম খলিফা সাইয়িদুনা আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর ওপর আল্লাহ রহম করুন। তিনি বলেছেন–

"উটের দড়ি হারিয়ে গেলেও আমি তা কুরআনে খুঁজে পাই।"[৪১]

প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা জিয়াউদ্দিন আর রইস তাঁর *আন নাজরিয়্যাতুস সিয়াসিয়্যাতুল ইসলামিয়্যাহ* (ইসলামি রাজনীতির তত্ত্ব)[৪২] গ্রন্থে বলেন–

"সন্দেহাতীতভাবে মুহাম্মাদ সা. এবং তাঁর অনুসারী মুমিনরা যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যদি সেই রাষ্ট্রকে বাহ্যিক কর্মকাণ্ড এবং আধুনিক রাজনৈতিক মানদণ্ডে বিবেচনা করা হয়, তাহলে 'রাজনীতি' শব্দের প্রত্যেকটি অর্থের বিবেচনায় তা ছিল– রাজনৈতিক রাষ্ট্র। একইসাথে যদি এই রাষ্ট্রের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ইতিবাচক কর্মকাণ্ড এবং মূল ভিত্তিকে বিবেচনা করা হয়, তাহলে একে বলতে হবে– দ্বীনি রাষ্ট্র।"

সুতরাং, রাষ্ট্রব্যবস্থা একই সময়ে দুটি বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট হতে পারে। কারণ, ইসলামের মৌলিকত্ব বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিককেই একসাথে মিলিয়ে নেয়। সেইসাথে মানুষের কর্মকে দুনিয়াবি ও পরকালীন জীবনে প্রভাবক হিসেবে দেখায়। অর্থাৎ, ইসলামের দর্শন দুটো বিষয়কেই একীভূত করে নেয়।

---

৪১. ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ছাত্র শাখার সম্মেলনে উপস্থাপিত রিসালা থেকে।

৪২. পৃষ্ঠা : ২৭-২৯

www.bjilibrary.com

কেবল দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছাড়া এ দুয়ের মাঝে আর কোনো বিভাজন ইসলাম স্বীকার করে না। সত্তাগতভাবেই তারা একসাথে গঠিত বা সাজানো এবং অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাদের একটিকে অপরটি থেকে আলাদা করে কল্পনা করা যায় না। এটি ইসলামের স্বাভাবিক প্রকৃতির মাঝেই সুস্পষ্ট। এটা প্রমাণের জন্য বড়ো কোনো পরিশ্রমের দরকার হয় না। ইতিহাসের বাস্তবতা এটাকেই জোরালোভাবে সমর্থন করে। অতীতের সকল যুগে মুসলিমদের আকিদা-বিশ্বাস ছিল এটাই। এমনকি প্রাচ্যবিদরা পর্যন্ত ইসলামি পরিবেশের কাছাকাছি না থাকলেও এটা বুঝতে শুরু করেছে। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার হলো– কিছু জন্মসূত্রে মুসলিম, যারা নিজেদের সংস্কারক বলেও দাবি করে, তারাই প্রকাশ্যে এই সত্যকে অস্বীকার করছে। তাদের দাবি হলো– 'ইসলাম শুধুই একটি ধর্মীয় দাওয়াত।'[৪৩] তারা বোঝাতে চাচ্ছে– 'ইসলাম কেবল একটি বিশ্বাস এবং মানুষের সাথে রবের আত্মিক সম্পর্ক মাত্র; দুনিয়ার জীবনের বৈষয়িক বিষয়াবলির সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই; এখানে যুদ্ধ ও সম্পদের ইস্যুগুলো রয়েছে– যার মূল রাজনীতি।' তাদের সকল কথার সারকথা হলো– 'দ্বীন এক জিনিস, আর রাজনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।'

এই সকল নামধারী মুসলিমদের কথার জবাবে ইসলামি স্কলারদের কথা আনার তেমন দরকার নেই। কেননা, এই নামধারী মুসলিমরা কখনোই প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করতে চায় না। তারা নিজেরা যা বলে, তা নিয়েই তৃপ্ত থাকতে চায়। ইতিহাসের বাস্তবতা নিয়েও কথা বলে লাভ নেই। তাতে তারা বড়োত্বের প্রতিযোগিতা শুরু করবে। তো আমরা কিছু ওরিয়েন্টালিস্ট ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গটা শেষ করতে চাই। এই ওরিয়েন্টালিস্ট গবেষকরা নিজেদের মতামত স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছে। তাদের মতগুলো উল্লেখ করার কারণ হলো– জন্মসূত্রে এই সকল কথিত মুসলিম সংস্কারবাদীরা ওরিয়েন্টালিস্টদের চেয়ে বেশি আধুনিক যুগের সাথে কখনোই সম্পৃক্ত ছিল না। তারা আধুনিক গবেষণাপদ্ধতির ব্যবহারে ওরিয়েন্টালিস্টদের চেয়ে বেশি সক্ষমও নয়।

---

৪৩. সর্বপ্রথম এই ভ্রান্ত মত প্রকাশ্যে ঘোষণা করে ও যুক্তি প্রদর্শন করে মানসুরার শরিয়াহ আদালতের সাবেক বিচারক ও ধর্মমন্ত্রী প্রফেসর আলি আবদুর রাজ্জাক। ১৯২৫ সালে 'ইসলাম ওয়া উসুলুল হুকম' শিরোনামে তার এই মত সংবলিত বইটি প্রকাশিত হয়। আমরা সামনের অধ্যায়গুলোতে তার ভ্রান্তি স্পষ্ট করতে বিস্তারিত আলোচনা করব। এ বিষয়ে আরও দেখুন আমার বই *আর রাদ্দু আলা দাআওয়ি বাদিল মুআসিরিন*-এর চতুর্থ অধ্যায়; তালিক : ড. রইস।

www.bjilibrary.com

বিজ্ঞানের অঙ্গনে ওরিয়েন্টালিস্টরা প্রত্যেকটি দিক থেকে তাদের চেয়ে এগিয়েই ছিল। তারা ওরিয়েন্টালিস্টদের মান্যও করে খুব গুরুত্বের সাথে। সুতরাং ওরিয়েন্টালিস্টদেরই কিছু উক্তি নিয়ে আসা এখানে প্রাসঙ্গিকই হবে–

Dr. V. Fitzgerald[44] : ইসলাম নিছক একটি ধর্ম নয়, এটি একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাও। এরপরও সাম্প্রতিক সময়গুলোতে কিছু আধুনিক দাবিদার মুসলিম সন্তানের আবির্ভাব ঘটেছে। তারা এ দুটোকে আলাদা করতে চায়। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ধারণা স্পষ্ট হলে দেখা যায়, ইসলাম অঙ্গাঙ্গিভাবে এ দুটি ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে; এর একটি থেকে অপরটিকে আলাদা করা যায় না।

C. A. Nallino[45] : মুহাম্মদ সা. একই সময়ে একটি দ্বীন এবং একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর পুরো জীবন জুড়ে রয়েছে এ দুটোর বিস্তার।

Dr. Schacht[46] : ইসলাম ধর্মের চেয়েও বেশি কিছু। ইসলাম আইনি ও রাজনৈতিক তত্ত্বও বর্ণনা করেছে। মোটকথা, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা– যা দ্বীন ও রাষ্ট্রকে একই সাথে শামিল করে।

R. Strothmann[47] : স্পষ্টতই ইসলাম একটি রাজনৈতিক ধর্ম। ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা একাধারে ছিলেন রাজনীতিক, বিচারক ও রাষ্ট্রনায়ক।

D. B. Macdonald[48] : এখানেই (মদিনা) প্রথম ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ইসলামি আইনের বুনিয়াদি দিকগুলো তৈরি হয়েছে।

Sir. T. Arnold[49] : নবি সা. একই সময়ে একটি ধর্মের প্রধান এবং একটি রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন।

---

৪৪. *MUHAMMEDAN LAW – CH*, I., P.1 (39)

৪৫. Cited by Sir T. Arnold in his book: *The Caliphate*. P. 198

৪৬. *Encyclopedia of social science*. Vol. VIII p. 333

৪৭. *The Encyclopedia of Islam*, IV. p. 350

৪৮. *Development of Muslim theology, jurisprudence and constitutional theory*. (New York 1903) p. 67

৪৯. *The Caliphate*. Oxford 1924, p. 30

www.bjilibrary.com

H. A. R. Gibb[৫০] : ইসলাম শুধু ব্যক্তিপর্যায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস নয়। ইসলাম একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিচ্ছে, যার রয়েছে নিজস্ব বিচারপদ্ধতি, আইনকানুন ও প্রশাসন।

এই কথাগুলো তাদের জন্যই উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের শুধু পাশ্চাত্যের কথাই সন্তুষ্ট করতে পারে। এই কথাগুলো তাদের বড়ো বড়ো কথা থামিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

*****

৫০. *Muhammedanism*, 1949, p. 3

www.bjilibrary.com

ভূখণ্ড ও জাতীয়তাবাদ

ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর প্রথম উসুলে রাজনীতির আরেকটি দিকের ওপর আলোকপাত করেছেন; আর তা হলো– দেশ ও জাতি। এ বিষয়টি তিনি স্বতন্ত্র একটি রিসালায়ও বিস্তারিত লিখেছেন। তিনি 'দেশ ও জাতি' শব্দাবলিকে রাষ্ট্রের ঠিক পাশে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বান্নার কথাটি দেখুন–

فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة.

"ইসলাম হচ্ছে রাষ্ট্র ও দেশ তথা শাসনব্যবস্থা ও জাতি।"

বস্তুত দেশ বা ভূখণ্ড ছাড়া কোনো রাষ্ট্র হয় না। রাষ্ট্রের আবশ্যকীয় একটি উপাদান হলো নির্দিষ্ট পরিমাপের স্বাধীন ভূখণ্ড– যাতে সুনির্দিষ্ট নেতৃত্ব ও শাসনকাঠামো থাকে। এটিই একটি রাষ্ট্র।

জাতীয়তাবাদীদের অনেকে অভিযোগ করে– ইসলামপন্থিরা নিজেদের দেশ ও জাতি নিয়ে তেমন উৎসাহ দেখায় না। এই অভিযোগ যথার্থ নয়। ইসলামপন্থিরা কীভাবে তাদের দেশ ও জাতি সম্পর্কে নিস্পৃহ হতে পারে? ইসলামপন্থিদের দেশগুলো তো ইসলামেরই ভূমি। তারা এই ভূমি ও রাষ্ট্রকে জান-মাল দিয়ে রক্ষা করে এবং এই রাষ্ট্রের সুরক্ষার জন্য প্রাণপাত করে। প্রকৃত ব্যাপার হলো, ইসলামপন্থিরা আঞ্চলিক সংকীর্ণতাবাদের বিষয়ে উৎসাহী নয়; বরং তারা এর বিরোধিতা করে। ইসলামপন্থিরা জাতীয়তাবাদকে অতিরঞ্জিত করে দ্বীনের সমপর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার বিরোধী। কেননা, কখনও কখনও একটি ভূখণ্ড হয়ে দাঁড়ায় পূজ্য মূর্তির মতো, তখন অন্যান্য পূজনীয়ের মতো রাষ্ট্র বা দেশেরও পূজা করা হয়।

কেউ কেউ বলে– জাতীয় আবেগ দ্বীনি আবেগের বিকল্প। একটু সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায়, অনেকে ইসলামকে জাতীয় আবেগের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। ফলে মালিকানা চলে যায় আল্লাহর পরিবর্তে রাষ্ট্রের হাতে। শপথ করা হয় আল্লাহর বদলে রাষ্ট্রের নামে। তখন বিভিন্ন কাজের উদ্বোধনও হয় রাষ্ট্রের নামে; আল্লাহর নামে নয়। তাদের সকল কর্মকাণ্ড চলে আল্লাহকে

www.bjilibrary.com

বাদ দিয়ে রাষ্ট্রকে উপলক্ষ করে। মূলত, ইসলামের কর্মীরা জাতীয়তাবাদের এই দিকগুলোর বিরোধিতা করে। ইসলামপন্থিদের অবস্থান কোনোভাবেই দেশপ্রেম বা দেশরক্ষার কাজের বিরুদ্ধে নয়। এ অবস্থান মোটেও দেশের স্বাধীনতা, উন্নতি ও বিকাশের বিপরীতে নয়। এ ব্যাপারে ইমাম বান্না তাঁর 'ইলাশ শাবাব (যুবকদের প্রতি)' শিরোনামীয় রিসালায় বলেছেন–

> "যদি কেউ মনে করে– ইখওয়ানুল মুসলিমিন দেশ ও জাতীয়তার বিরোধী, তাহলে সে ভুল করবে। মুসলিমরাই নিজেদের দেশের প্রতি সবচেয়ে বেশি একনিষ্ঠ এবং দেশের সেবায় আত্মোৎসর্গকারী। যারা দেশের কল্যাণে কাজ করে, ইখওয়ান তাদের সর্বোচ্চ সম্মান করে।
>
> ইসলামের কর্মী ও সাধারণ জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে দেশ ও জাতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য আছে। ইসলামের কর্মীদের জাতীয়তাবোধের মূলমন্ত্র হলো– ইসলামি বিশ্বাস ও ঈমান। ইসলামপন্থিরা মিশরের মতো দেশগুলোর জন্য কাজ করে। তারা এ দেশগুলোর জন্য সর্বস্ব উজাড় করে জিহাদ করে। কারণ, এটা ইসলাম ও মুসলিম জাতিসমূহের ভূখণ্ড। ইসলামপন্থিরা এ অনুভূতিকে কেবল নির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ডের সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ করে রাখে না। ইসলামপন্থিরা সকল ইসলামি দেশ ও মুসলিম ভূখণ্ডের জন্য একই অনুভূতি লালন করে। আর জাতীয়তাবাদীরা শুধু নিজেদের সীমিত গণ্ডির একটি ভূখণ্ডের ভেতরে কাজ করে। ঐতিহ্যগত কিছু বিষয়ে প্রচারমুখিতা, জাতীয় অর্জনের গৌরবের বিষয়াদি ও সুবিধাবাদী ক্ষেত্রগুলোতে ছাড়া এসব জাতীয়তাবাদীদের দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগ্রত হতে দেখা যায় না।
>
> পক্ষান্তরে ইখওয়ানের জাতীয়তাবোধকে জানার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তারা চূড়ান্ত ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে– কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে অবরোধ বা তার সাথে শত্রুতামূলক আচরণ ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। মুসলিম ভূখণ্ডে আগ্রাসন ও অবরোধকারীদের রুখে দেওয়ার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করে যাবে ইখওয়ান। এমনকি ইখওয়ানুল মুসলিমিন আগ্রাসী হানাদারদের নিরাপদে ফিরে যেতে দিতেও রাজি নয়; বরং আগ্রাসনের শাস্তিস্বরূপ তাদের আগ্রাসনকৃত ভূমিতেই ধ্বংস করা কাম্য। এর বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করার কোনো সুযোগ আল্লাহর পক্ষ থেকে খোলা নেই।"[৫১]

---

৫১. *ইলাশ শাবাব* (যুবকদের প্রতি) শিরোনামের রিসালা থেকে, পৃষ্ঠা : ১০৪-০৫; *মাজমুয়ু রাসায়িলিল ইমাম আশ শাহিদ*, দারুদ দাওয়াহ, আলেক্সান্দ্রিয়া।

www.bjilibrary.com

দাওয়াতুনা (আমাদের দাওয়াত) নামক অপর এক রিসালায় ইমাম বান্না জাতীয়তাবাদের বিষয়াদিকে আরও খোলাখুলিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এ বিষয়ে দুর্বোধ্য ও একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকা শব্দগুলোর অর্থ সুনির্দিষ্টকরণে তিনি জোর দিতেন। কেননা, কিছু কিছু বিষয় যে যার মতো করে ব্যাখ্যা করছিল। নিজ নিজ মতের অনুকরণে সবারই ছিল স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা। ইমাম বান্না এগুলোর শাব্দিক ও প্রায়োগিক অর্থ স্পষ্ট করে বর্ণনা করতেন। এই রিসালায় তিনি চলমান সময়ে কর্তৃত্ববাদী এবং চিন্তাধারায় প্রভাব বিস্তারকারী মতবাদগুলো নিয়ে পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছেন। আর তার মধ্যে রয়েছে জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে তাৎপর্যবহ আলাপ।

ইমাম বান্নার বক্তব্য থেকে দীর্ঘ অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি, তিনি বলেন–

"মানুষ একবার জাতীয়তাবাদের ডাকে আকৃষ্ট হলো, আবার আকৃষ্ট হলো দেশাত্মবোধের ডাকে। বিশেষ করে প্রাচ্যের মানুষ ও প্রাচ্যের জাতিগুলো তাদের প্রতি পাশ্চাত্যের অবিচার, অবজ্ঞা ও নিষ্পেষণের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠল। পাশ্চাত্যের অবিচার প্রাচ্যের মানুষদের সম্মান, মর্যাদা ও স্বাধীনতাকে আঘাত করছে। তাদের জানমালের ওপর হস্তক্ষেপ করছে। গলায় চেপে বসা পশ্চিমা জোয়াল প্রাচ্যের মানুষদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। তারা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য ও প্রচেষ্টার সবটুকু দিয়ে যেকোনো মূল্যে এ গোলামি থেকে পরিত্রাণ চায়। এমনকি এ কাজে তারা কঠোর থেকে কঠোরতর ভূমিকা পালন করতেও পিছপা হবে না। ফলে প্রাচ্যের নেতাদের কণ্ঠগুলো সরব হলো। লেখক, বক্তা, আলোচক, সংবাদপত্র– সবাই দেশপ্রেম ও জাতীয় মুক্তির মর্যাদাগাথা অনবরত গেয়েই চলল। নিঃসন্দেহে ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে এই জাগরণ উত্তম এবং জাতীয় মুক্তির এই উপলব্ধি চমৎকার।

কিন্তু যখন আপনি বলবেন– 'ইসলামে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আরও বেশি গুরুত্ব, তাৎপর্য ও মর্যাদা আছে। পাশ্চাত্য বা ইউরোপীয়দের বক্তব্য বা লেখায় জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার বিষয়ে যেসব আলাপ এসেছে– ইসলামে স্বাধীনতার অবস্থান তার চেয়েও বড়ো', তখন তারা আপনার কথা বুঝতে চাইবে না। তারা আপনার কথার বিরোধিতা করবে এবং পুরোনো বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হবে। তখন তারা উলটো আপনাকে বোঝাতে চাইবে– 'ইসলামের চিন্তা একরকম, আর জাতীয়তাবাদ (জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতা) ভিন্নমুখী চিন্তা; এগুলো আলাদা বিষয়।' প্রাচ্যের মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই মনে করে, ইসলাম নিয়ে কাজ করার উদ্যোগ জাতিকে বিভক্ত করবে, যুব সমাজের ঐক্য দুর্বল করে দেবে।

www.bjilibrary.com

এই ভুল ধারণাটি প্রাচ্যের মুসলিম জাতিগুলোর জন্য সবদিক থেকেই ভয়ানক। এ কারণে আমি এখানে জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধ সম্পর্কে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অবস্থান স্পষ্ট করতে চাই। ইখওয়ানুল মুসলিমিন এই অবস্থান নিজেরা গ্রহণ করেছে এবং ইখওয়ান চায়– জনগণও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই অবস্থান গ্রহণ করুক।

জাতীয়তাবাদীরা যদি জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধ বলতে স্বীয় ভূখণ্ডের প্রতি ভালোবাসা, হৃদ্যতা, আকর্ষণ কিংবা ঝোঁকপ্রবণতা উদ্দেশ্য করে, তাহলে বলতে হয়– এটা তো স্বাভাবিক মানবীয় প্রবণতা এবং ইসলামেরও নির্দেশনা। সাইয়িদুনা বিলাল রা., যিনি বিশ্বাস ও দ্বীনের তরে নিজের সবকিছু কুরবান করে দিয়েছেন, তিনি দারুল হিজরতে চিৎকার করে মক্কার স্মরণে কবিতার চরণ আবৃত্তি করতেন।[৫২]

রাসূল সা. একবার কাউকে বলতে শুনলেন, 'মক্কা তো আভিজাত্যের বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট'। এ কথা শুনে রাসূল সা.-এর চোখজোড়া অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তিনি বললেন– يا أصيل! دع القلوب تقر 'হে অভিজাত নগরী! আমার হৃদয়কে শান্ত থাকতে দাও।'

যদি অর্থ করা হয়– জাতীয়তাবাদ মানে আধিপত্যবাদীদের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করা, সার্বভৌমত্বের পূর্ণতা আনয়ন এবং জাতির মনে স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদাবোধের বীজ বপন, তাহলে ইসলাম তো এই বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

...وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

'শক্তি-মর্যাদা তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরই। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।' সূরা মুনাফিকুন : ৮

...وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

'আল্লাহ কখনোই মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্য কোনো পথ রাখবেন না।' সূরা নিসা : ১৪১

---

৫২. হাদিসটি বুখারি ও মুসলিমে আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তবে কবিতার চরণগুলি শুধু বুখারির বর্ণনায় এসেছে। (বুখারি : ৬৭৩৭)

www.bjilibrary.com

জাতীয়তাবাদ দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয়– একই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মাঝে বন্ধন মজবুত করা এবং এই মজবুত বন্ধনকে নিজেদের কল্যাণে কাজে লাগানো, তাহলে এই উদ্দেশ্যের সাথে ইসলাম সম্পূর্ণ একমত। ইসলাম এই উদ্দেশ্যকে অত্যাবশ্যকীয় ফরজ মনে করে। রাসূল সা. বলেন–

كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

'তোমরা আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে যাও।'[৫৩]

কুরআনের ভাষ্য হলো–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। কেননা, তারা তোমাদের ক্ষতি করতে কোনো ত্রুটি করে না। তোমরা কষ্টে থাকো, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরও অনেকগুণ বেশি জঘন্য। তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।' সূরা আলে ইমরান : ১১৮

জাতীয়তাবাদ অর্থ যদি ভূখণ্ড জয় ও পৃথিবীর নেতৃত্ব বোঝানো হয়, তাহলে ইসলাম এ কাজকে তো ফরজ সাব্যস্ত করেছে। ইসলাম বিজয়ীদের উদ্দেশে বলেছে, অভিযান অব্যাহত রাখতে এবং সবচেয়ে বরকতময় বিজয় অর্জন করা পর্যন্ত না থামতে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ... ﴿١٩٣﴾

'ফিতনা-ফাসাদ দূরীভূত হয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো।' সূরা বাকারা : ১৯৩

---

৫৩. হাদিসটি ইমাম আহমাদ ও মুসলিম নিজ নিজ সংকলনে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, যেভাবে *সহিহ জামিউস সাগির* গ্রন্থে রয়েছে। (হাদিসটি সিহাহ সিত্তার প্রতিটি গ্রন্থেই সংকলিত হয়েছে। বুখারি : ৫১৪৪, ৬০৬৬; মুসলিম : ২৫৬৩, ২৫৬৪; আবু দাউদ : ৩৪৩৮; তিরমিযি : ১১৩৪; নাসায়ি : ৩২৩৯; ইবনে মাজাহ : ১৮৬৭)

www.bjilibrary.com

আর যদি জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্য হয়– উম্মাহকে টুকরো টুকরো করে অনেকগুলো ভাগ করা এবং পরস্পর হানাহানি, বিদ্বেষ, উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়, অপবাদ রটানো, ষড়যন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হওয়া। এমনভাবে তাদের বিক্ষিপ্ত করা যে, তারা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নতুন নতুন পথ ও মতের জন্ম দেবে। আর এ সুযোগে শত্রুপক্ষ তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই বিচ্ছিন্নতাকে লুফে নেবে। উম্মাহর বিভিন্ন অংশকে সত্যচ্যুতি ও বাতিলের ওপর একত্রিত করার জন্য তারা জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করবে। মুসলিমদের এমনভাবে প্ররোচিত করবে যে, তারা একে অপরের মাঝে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বন্ধ করে দেবে, জাতীয়তাবাদী সম্পর্ক ও তার বৃত্তে তাদের দৃষ্টি আবদ্ধ করে রাখবে, নিজেদের অঞ্চল ও দেশ ছাড়া অন্য কিছুর জন্য কাজও করবে না, মিলিতও হবে না। তাহলে বলব– এটি একটি নিকৃষ্ট জাতীয়তাবাদ। এতে জনগণের জন্য কোনো সুফল নেই, স্বয়ং জাতীয়তাবাদীদেরও কোনো লাভ নেই।

প্রিয় পাঠক! আপনারা লক্ষ করবেন, আমরা জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধের সাথে আছি। জাতীয়তাবাদের কল্যাণকর দিকগুলোতে স্বয়ং জাতীয়তাবাদী দাবিদারদের চেয়েও আমরা এগিয়ে আছি। আমি মনে করি, জাতীয়তাবাদের বৃহৎ ও উন্নত এই ধারণা ইসলামের শিক্ষারই একটা অংশ।

আমাদের জাতীয়তাবাদের পরিসীমা

ইসলামপন্থি ও সাধারণ জাতীয়তাবাদীদের মাঝে পার্থক্য হলো– আমরা জাতীয়তার সীমা নির্ধারণ করি বিশ্বাসের মানদণ্ডে। আর তারা ভৌগোলিক সীমানার ওপর জাতীয়তাবাদের সীমানা নির্ধারণ করে। সুতরাং, যে ভূমিতেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার মতো কোনো মুসলিম আছে, সেই ভূমিই আমাদের। সেই ভূমির মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষা করা, সেই দেশের প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিকতা এবং সে ভূখণ্ডের উন্নয়নে সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো আমাদের কর্তব্য। সেই ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রত্যেক মুসলিমই আমাদের পরিবারভুক্ত। তারা আমাদের ভাই। আমরা তাদের যথাযথ গুরুত্ব দিই। তাদের আনন্দে আনন্দিত হই এবং তাদের দুঃখে হই দুঃখিত।

পক্ষান্তরে নিছক জাতীয়তাবাদীদের অনুভূতি এরূপ নয়; বরং তাদের সমস্ত মনোযোগ তাদের সেই সীমিত ভূখণ্ডেই নিবদ্ধ। কার্যত তাদের ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিগত ব্যবধানটা এখানেই। যেকোনো জাতি অপরাপর জাতিগুলোর

www.bjilibrary.com

তুলনায় নিজেদের শক্তিশালী করতে চায়। কিন্তু আমরা ইসলামপন্থিরা শুধু নিজেদের উন্নতিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। আমরা একইসাথে সকল মুসলিম ভূখণ্ড ও জাতিকে শক্তিশালী দেখতে চাই, যারা একে অপরকে মজবুত করে তুলবে। নিরেট জাতীয়তাবাদীরা একাকী উন্নতিতে কোনো সমস্যা দেখে না। কিন্তু এমন স্বার্থবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে মুসলিম ভূখণ্ডসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক হৃদ্যতার পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতার দিকে পা বাড়ায়। উম্মাহর শক্তিগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে শত্রুরা আমাদের একজনের দ্বারা অন্যজনকে আঘাত করার সুযোগ পেয়ে যায়।

আমাদের জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত সীমা

উপর্যুক্ত আলোচনা এ বিষয়ের একটি দিক। এর আরেকটি দিক আছে। আর সেই দ্বিতীয় দিকটি হলো– জাতীয়তাবাদীরা যখন দেশের অগ্রগতি ও সংহতির জন্য কাজ করে, তখন তারা ইউরোপীয়দের মতো কেবল বস্তুগত বিষয়েই গুরুত্ব দেয়। পক্ষান্তরে ইসলামপন্থিদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো– প্রত্যেক মুসলিমের কাঁধে কিছু দায়িত্ব রয়েছে। আর সেই দায়িত্ব তারা নিজের সম্পদ, সামর্থ্য ও সময় বিনিয়োগের মাধ্যমে পালন করার চেষ্টা করে যায়। সেই দায়িত্ব হলো– মানবজাতিকে ইসলামের হিদায়াত পৌঁছে দেওয়া এবং ইসলামের পতাকাকে পৃথিবীর সকল প্রান্তে সমুন্নত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। এ কাজ করতে গিয়ে ইসলামপন্থিরা সম্পদ, খ্যাতি বা আধিপত্যের জন্য লালায়িত হয় না, কিংবা কোনো জাতিকে দাসও বানাতে চায় না। ইসলামপন্থিরা কেবল এক আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়। আল্লাহর দ্বীন ও কালিমার বাণী সমুচ্চ করার মাধ্যমে পৃথিবীবাসীকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করতে চায়। আমাদের মহান পূর্বসূরিগণ এ গন্তব্যের দিকে উম্মাহকে পরিচালনা করেছিলেন। আর তাতে পুরো পৃথিবী বিস্ময়বিমুগ্ধ চোখে তাদের সেই ইতিহাস বিনির্মাণের প্রতিটি পদক্ষেপ প্রত্যক্ষ করেছিল। ক্ষিপ্রতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও আভিজাত্যে তারা ইতিহাসের সকল নজিরকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।

ঐক্য ও ধর্মীয় বিভিন্নতা

একটি বিষয়ে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। কেউ কেউ বলে থাকে– 'ধর্মীয় নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র চালানোর স্বপ্ন ও চেষ্টা জাতীয় ঐক্যকে ধ্বংস করে।' অর্থাৎ, ইসলামের নির্দেশনার ভিত্তিতে রাজনীতি করা কিংবা ইসলামের ভিত্তিতে

www.bjilibrary.com

রাষ্ট্রকে পরিগঠনের প্রচেষ্টা জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থি।' এই ধরনের কথা অসার ও অযৌক্তিক। জেনে রাখুন, ইসলাম ঐক্যের দ্বীন। যতক্ষণ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী নাগরিকগণ কল্যাণের কাজে সহযোগিতা করবে, ততক্ষণ তাদের সকলের সাথে ঐক্য ও সমঝোতার সম্পর্ক জিইয়ে রাখার জিম্মাদার ইসলাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٨﴾

'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।' সূরা মুমতাহিনা : ৮

তাহলে এই বিভাজনগুলো কোথা থেকে আসে?[৫৪]

আমরা দেশপ্রেম ও দেশের কল্যাণের মতো বেশ কিছু বিষয়ে চরমপন্থি জাতীয়তাবাদীদের সাথেও একমত। দেশের স্বাধীনতা, উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টায় তাদের পথ এবং আমাদের পথ অভিন্ন। এ বিষয়গুলোতে যারা একনিষ্ঠ, আমরা তাদের সাথে কাজ করি, তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করি। আমি বলতে চাচ্ছি, নিরেট জাতীয়তাবাদীদের কাজটা যদি দেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং দেশের মর্যাদা পুনরুদ্ধার পর্যন্ত হয়, তাহলে এটা তো ইখওয়ানের কর্মসূচিরই অংশ। ইখওয়ানের জাতীয়তাবাদ ধারণার কাজের একটি বড়ো অংশ সাধারণ জাতীয়তাবাদীদের সাথে যুগপৎভাবে সম্পন্ন হতে পারে। বাকি থাকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের পতাকা উড্ডীনের কাজ, কুরআনের বাণী সব জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ।"[৫৫]

---

৫৪. দেখুন, আমার বই *গাইরুল মুসলিমিনা ফিল মুজতামায়িল ইসলামি* (ইসলামি সমাজে অমুসলিম নাগরিক) এবং *বাইয়িনাতুল হাল্লিল ইসলামি ওয়া শুবুহাতুল আলমানিয়্যিন ওয়াল মুতাগাররিবিন* (জীবন-সমস্যার সমাধানে ইসলাম এবং সেক্যুলার ও পাশ্চাত্যবাদীদের আপত্তির জবাব)-এর 'আল হাল্লুল ইসলামি ওয়া আকাল্লিয়্যাতুত দীনিয়্যাহ' অধ্যায়।

৫৫. *দাওয়াতুনা* রিসালা থেকে, পৃষ্ঠা : ২৪-২৭, *মাজমুয়ু রাসায়িলিল ইমাম আশ শাহিদ*, দারুদ দাওয়াহ, অলেক্সান্দ্রিয়া।

www.bjilibrary.com

ইমাম বান্নার চিন্তায় মিশরি জাতীয়তাবাদ

এরপর ইমাম হাসান আল বান্না আরব ও মিশরি জাতীয়তাবাদের বিষয়ে আলাপ তোলেন। ইমাম বান্নার ব্যাখ্যায় মিশরি জাতীয়তাবাদ মানে মিশরের প্রতি একাগ্র ভালোবাসা, মিশরের স্বাধীনতার জন্য কাজ করা এবং মিশরের সার্বিক উন্নতির জন্য একটি জাগরণ গড়ে তোলা। ইমাম বান্না বলেন–

"আমাদের দাওয়াতি আন্দোলনে মিশরি জাতীয়তাবাদের[৫৬] যথাযথ মূল্যায়ন ও মর্যাদা রয়েছে। আমাদের আন্দোলন সংগ্রামে মিশরি জাতীয়তাবোধের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ রয়েছে।

আমরা মিশরি। এই সম্মানিত ভূমিতে আমরা জন্মেছি। মিশরের বুকে বড়ো হয়েছি। মিশর মুসলিমদের দেশ। এ দেশ ইসলামকে সম্মানের সাথে আলিঙ্গন করে নিয়েছিল। শুধু আলিঙ্গনই করেনি; বরং ইসলামের সাথে মিশে গিয়েছে। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে ইসলামের শত্রুদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে মিশর। উদার মনোবাসনা ও সর্বোত্তম উদ্দীপনা নিয়ে মিশর ইসলামে নিজেকে বিলীন করেছে। ইসলাম ছাড়া মিশর সুস্থ থাকতে পারে না। ইসলামই মিশরের চিকিৎসা ও প্রেসক্রিপশন এবং ইসলামই মিশরের প্রতিষেধক। ইসলামের ছোঁয়ায় মিশরের বহু বড়ো বড়ো সমস্যার সমাধান হয়েছে।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মতো সংগঠনের জন্ম এই মিশরে। তাহলে কেন আমরা মিশরের কল্যাণে কাজ করব না? কেন আমরা আমাদের সবটুকু সক্ষমতা দিয়ে মিশরকে রক্ষা করব না? এ কথা কীভাবে আসে যে, মিশরি জাতীয়তাবাদ ও ইসলামের দায়িত্বগুলো একসাথে পালিত হতে পারে না!

জন্মভূমি মিশরকে আমরা ভালোবাসি। মিশরের সমৃদ্ধির জন্য কাজ করি বলে আমরা গর্বিত। আমরা মিশরের কল্যাণে সংগ্রাম করি। কাঙ্ক্ষিত জাগরণের পর্ব সূচিত হয়েছে মিশরে। আর মিশর আরবভূমির একটি অংশ। আমরা মিশরের জন্য কাজ করি। একইসাথে আমরা আরব-জাহান, প্রাচ্য ও ইসলামের জন্য কাজ করি।

---

৫৬. লক্ষণীয় যে, উসতায আল বান্না মিশরীয়তাকে জাতীয়তাবাদের সমার্থক হিসেবে এনেছেন। এ ধরনের শব্দ সব সময় তার অর্থকে আক্ষরিকভাবে নির্দেশ করে না। তিনি 'দাওয়াতুনা' রিসালায় এ দুটোর মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য করেছেন, সে বিষয়ে পরে আমরা আরও বিশদ আলোচনা করব।

www.bjilibrary.com

মিশরের প্রতি ভালোবাসার এই দিকগুলো প্রাচীন মিশরের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে লালন করতে আমাদের বাধ্য করে না। প্রাচীন মিশরীয়রা সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিল। ইতিহাস অধ্যয়নের দৃষ্টিতে আমরা জ্ঞান-মহত্ত্ব-সভ্যতা ভরা প্রাচীন মিশরকেও সমীহের চোখে দেখি। কিন্তু এর দ্বারা যদি সে যুগের মিশরি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিকে আহ্বান করা হয়, তাহলে আমরা এর দর্শন ও সভ্যতার কার্যকারিতার বিরোধিতা করি।

আল্লাহ তায়ালা মিশরকে পথপ্রদর্শন করেছেন ইসলামি জ্ঞান দিয়ে এবং মিশরের বক্ষকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন ইসলামের ছোঁয়ায়। ইসলাম এসে মিশরের মর্যাদা ও সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে মিশরে চলে আসা মূর্তিপূজা, শিরক ও জাহিলি রীতির কদর্যতার ইতিহাসকে ইসলাম মিটিয়ে দিয়েছে।"[৫৭]

জাতীয়তা ও স্বাধীনতার ইস্যুতে ইখওয়ানের সম্মেলন

ইমাম হাসান আল বান্না শুধু তাঁর রিসালা বা গবেষণাপত্রসমূহে জন্মভূমি ও জাতীয়তাবাদ নিয়ে কথা বলাকে যথেষ্ট মনে করেননি; তিনি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও সাধারণ সম্মেলনগুলোতেও এগুলো নিয়ে আলোচনা করতেন। একবার আমি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের একটি সাধারণ সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলাম। জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যুকে সামনে রেখে মিশরের আঞ্চলিক রাজধানীসমূহে এসকল ধারাবাহিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। ইমাম বান্না ও তাঁর সাথিরা সেখানে কথা বলেছেন। এটা ছিল ১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে, যখন বিশ্বের জাতিগুলো স্বাধীনতার দাবিতে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলছিল।

ধারাবাহিকতায় তানতায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনটিতে আমি উপস্থিত ছিলাম। তখন আমি তানতায় পড়াশোনা করছি। উসতায বান্না সে সম্মেলনে জন্মভূমি নিয়ে যে কথাগুলো বলছিলেন, এখনও তা আমার হৃদয়পটে জাগরুক আছে। তিনি জন্মভূমির ধারণাকে তিন ভাগে শ্রেণিকরণ করলেন :

১. প্রাথমিক জন্মভূমি
২. বড়ো জন্মভূমি এবং
৩. বৃহত্তর জন্মভূমি।

---

৫৭. *ইলাশ শাবাব, মাজমুউর রাসায়িল*, পৃষ্ঠা : ১২৯

www.bjilibrary.com

প্রাথমিক জন্মভূমি : প্রাথমিক জন্মভূমি হলো নীল উপত্যকা এবং এর উত্তর ও দক্ষিণের এলাকা। নীল উপত্যকার দক্ষিণে সুদান এবং উত্তরে মিশর। উসতায হাসান আল বান্না বলছিলেন– 'মিশর হলো উত্তর সুদান এবং সুদান হলো দক্ষিণ মিশর। আমরা সুদানের, সুদান আমাদের।' এ সম্মেলনের আলোচনায় দুটি বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল– ঔপনিবেশিক ইংরেজদের বিতাড়ন এবং নীল উপত্যকার ঐক্য।

বড়ো জন্মভূমি : বড়ো জন্মভূমি হলো আরব (সমগ্র আরবভূমি)। শাইখ বান্না আরবভূমির বিস্তৃতি নিয়ে যখন কথা বলছিলেন, তখন আমি প্রথমবারের মতো জন্মভূমির এমন ধারণার বিষয়ে শুনলাম। তিনি বললেন– আটলান্টিক মহাসাগর থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বড়ো জন্মভূমি বিস্তৃত। সে সময়ের পরিভাষা অনুযায়ী তিনি পারস্য উপসাগর বলেছিলেন। কারণ, তখনও আরব সাগর নামটি পরিচিতি পায়নি। এটার একদিকে ছিল আরব, অপরদিকে পারস্য। এ কারণে অনেকে এই সাগরকে ইসলামি উপসাগর নামকরণের প্রস্তাব রেখেছিল।

ইমাম বান্না এই পয়েন্টে আলোচনার সময় ফিলিস্তিন সমস্যা নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি ইহুদিবাদের ভয়াবহতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ইমাম বান্না বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলছিলেন– "ইহুদিবাদ আরবভূমি এবং মুসলিমদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নিদারুণ ভয়াবহতার দিকে নিয়ে যাবে।"

বৃহত্তর জন্মভূমি : এটা হলো ইসলামের ভূমি। এক মহাসাগর থেকে আরেক মহাসাগর পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত। কাসাব্লাংকা থেকে জাকার্তা পর্যন্ত। এমনকি ইমাম বান্না আন্দালুসকেও ইসলামের ভূমি মনে করতেন, যেখান থেকে আটশত বছরের সভ্যতাকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

এ সম্মেলনের একটি প্রসঙ্গ আমার স্মৃতিকে আজও নাড়া দিয়ে যায়। সেদিন আমাদের নেতৃস্থানীয় এক ভাই সুয়েজে মিশরের অধিকার নিয়ে বক্তৃতা করলেন। এ বিষয়ে তার বিস্তর পড়াশোনা ছিল। তার বক্তব্য ছিল তেজস্বী ও যৌক্তিক। তার এই বক্তৃতা শুনে ইমাম বান্না তাকে সফরসঙ্গী করে নেন। ফলে তিনি নিজের কথাগুলো সব প্রদেশের লোকদের সামনে বলার সুযোগ পান। তরুণ কাউকে এভাবে মূল্যায়ন করাটা জাতীয় ঐক্যের ইস্যুকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া এবং ইসলামের উদারতার একটি প্রতীক হয়ে থাকল।

www.bjilibrary.com

ইমাম বান্না এই সম্মেলনসমূহে বিশেষ বা প্রাথমিক জন্মভূমি এবং ইংরেজ আধিপত্যবাদ নিয়ে যা বলেছেন, তার কিয়দংশ এখানে উল্লেখ করতে চাই। আমরা কীভাবে ঔপনিবেশিকদের মোকাবিলা করব? মোকাবিলার পদ্ধতিই-বা কী হবে? এ বিষয়ে ইমাম হাসান আল বান্না কয়েকটি পদ্ধতির কথা বলেন।

এক. শান্তিপূর্ণ আলোচনা : দক্ষিণ ও উত্তরের ভূমি নিয়ে কোনো সহিংসতা ছাড়াই আলোচনা।

দুই. বয়কট : ইংরেজরা যদি তাদের স্বভাবজাত জেদ ও দাম্ভিকতা দেখিয়ে আলোচনায় না বসে, তাহলে তাদের বয়কট করা।

তিন. জিহাদ : আমাদের যদি বয়কটের সুযোগও দেওয়া না হয় অথবা বয়কট যদি ফলপ্রসূ না হয়, তাহলে সর্বাত্মক জিহাদ ভিন্ন আর কোনো পথ খোলা নেই। তখন সমগ্র জাতি তাদের পেশাগত ব্যস্ততা ছেড়ে কেবল স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষায় যুদ্ধে লিপ্ত হবে। দুটি উত্তম জিনিসের কোনো একটির সন্ধানে তারা লড়বে– বিজয় কিংবা জান্নাত।

এ সময় ইমাম হাসান আল বান্না বলেন–

"আমি ছোটোবেলায় একটি দুআ মুখস্থ করেছি। আমি এই দুআ বারবার আবৃত্তি করতে থাকতাম–

اللهم ارزقنى الحياة الحسنة والموتة الحسنة.

'হে আল্লাহ! আমাকে উত্তম জীবন ও উত্তম মৃত্যু দান করো।'

উত্তম মৃত্যু কোনটি? উত্তম মৃত্যু মানে কি নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করা– গাঁধাও যেমনটি করে? একটি গাধাও তো নিজ জায়গায় মরে। আমি এর একটি অর্থই পেয়েছি। সেটা হলো এটা থেকে এটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া (তিনি নিজের মাথা ও শরীরের দিকে ইশারা করেন)।"

এ সময় গোটা সম্মেলন 'আল্লাহু আকবার' এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর গগনবিদারী ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল। এই মনোবৃত্তি, এই শিক্ষা ইখওয়ান তাদের চিন্তা ও মননে লালন করত। জন্মভূমির প্রতিরক্ষায় ইখওয়ানই ছিল সবচেয়ে অগ্রগামী। ইখওয়ানুল মুসলিমিন এই কাজকে ইসলামের অংশ মনে করত। এক্ষেত্রে প্রাথমিক ও বৃহত্তর জন্মভূমির অনুভূতি একই। কেবল তত্ত্বকথা ও বক্তৃতাতেই নয়; বরং ইখওয়ানুল মুসলিমিন তাদের এই চিন্তাকে বাস্তবে পরিণত করেছিল।

www.bjilibrary.com

ফিলিস্তিনের যুদ্ধে ইখওয়ানের সদস্যরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তারা নিজেদের রক্তে ইসলামের ভূমির বিজয় প্রত্যাশা করেছিলেন। এ যুদ্ধে ইখওয়ানের অবদানের কিছু চিত্র উসতায কামিল শরিফ তাঁর বই *আল ইখওয়ানুল মুসলিমুন ফি হারবি ফিলিস্তিন* (ফিলিস্তিনের যুদ্ধে ইখওয়ানুল মুসলিমিন)-এ চিত্রায়িত করেছেন। ইখওয়ানের এই লড়াকু কর্মকাণ্ডের ফলাফল ৮ ডিসেম্বর ১৯৪৮-এর চুক্তি পর্যন্ত গড়ায়।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন যে ধারাবাহিক অন্যায়, জুলুম ও অকথ্য নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছে, তার একটা বড়ো কারণ হলো– ফিলিস্তিন ইস্যুতে তাদের অবস্থান। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৮ সালে ফায়েদ শিবিরে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সে বৈঠকে আমেরিকা-ব্রিটেন-ফ্রান্স দূতাবাসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এবং মিশরের শাসকগোষ্ঠী মিলিত হয়। এর পরপর পশ্চিমাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ইখওয়ানের বিরুদ্ধে এক অভূতপূর্ব অভিযান পরিচালিত হয়। ফায়েদ শিবিরে বৈঠকের পর নাকরাশি ও তার সরকারের পক্ষ থেকে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর দাবির পক্ষে হ্যাঁ-সূচক তৎপরতা ও গ্রহণযোগ্য নথিগুলো– এটার সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

ইখওয়ানের ওপর পরবর্তী বিপর্যয় আসে ১৯৬৫ সালে। আর সেটা ছিল ১৯৬৭ সালের দুর্যোগের ভূমিকা। তেল আল কাবির (Tell El Kebir) ও সুয়েজ খালের যুদ্ধগুলোতে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ভূমিকা ছিল প্রসিদ্ধ ও অনস্বীকার্য; বিশেষ করে শাহাদাতের প্রেরণাদায়ী ঘটনাবলি। সেসব শহিদদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র আমর শাহিন, আল মানিসি, গানিম প্রমুখের কুরবানি ও দুঃসাহসী অভিযান তো কিংবদন্তিতুল্য। আমরা আল আজহারের ছাত্ররা এসময় মার্চে অংশগ্রহণ করি। আজহারের দাররাসা ক্যাম্পাসে আমরা শিবির স্থাপন করেছিলাম। আমাদের বিগ্রেড শারকিয়্যাহ জেলা পরিভ্রমণ করে। সেখানকার ইমাম মুহাম্মাদ আবদুহু হলে আমরা একটি জমজমাট সম্মেলনও করেছিলাম।

এ ঘটনাগুলোর কিছু কিছু উসতায কামিল শরিফ *আল মুকাওয়ামুস সিররিয়্যাহ ফি কানাতিস সুইস* (সুয়েজে গোপন প্রতিরোধ) বইয়ে এবং উসতায হাসান দুহ তাঁর *কিফাহুশ শাবাবিল জামিয়ি ফি কানাতিস সুইস* (সুয়েজে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের প্রতিরোধ যুদ্ধ) বইতে চিত্রায়িত করেছেন।

দেশসেবার অন্যান্য অঙ্গনেও ইখওয়ানুল মুসলিমিন যে বিপুল পরিমাণ কাজ করেছে– তা বর্ণনার ঊর্ধ্বে। মিশরের প্রতিটি গ্রাম ও শহর ইখওয়ানুল মুসলিমিনের শিক্ষামূলক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য দেবে।

www.bjilibrary.com

ইখওয়ানের সামাজিক কর্মকাণ্ড নিয়ে বিশিষ্ট লেখক উসতায মুহাম্মাদ শাওকি জাকি *আল ইখওয়ান ওয়াল মুজতামায়ুল মিসর* (ইখওয়ান ও মিশরের সমাজ) নামে একটি বই লিখেছেন। এই কাজগুলো ইখওয়ান শুধু মিশরেই করেনি; বরং পার্শ্ববর্তী যে দেশগুলোতে ইখওয়ানের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়েছিল, সে দেশগুলোতেও করেছে।

সমাজসেবামূলক ভাষণ-বক্তৃতা, দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মসূচি ঘোষণা ও সেই কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইখওয়ানের ব্যাপারে এ কথা ছড়িয়ে পড়েছে যে– দেশপ্রেম ও দেশের জন্য প্রাণপণ লড়াইয়ে ইখওয়ানুল মুসলিমিনই হলো সবচেয়ে সত্যবাদী। চিন্তা ও প্রাণের বিনিময়ে ইসলাম রক্ষায় ইখওয়ান অগ্রণী। ইখওয়ান ঈমানের দাবি থেকেই এসব করে। ইখওয়ান এ কাজটি করে ইসলাম-নির্ধারিত দায়িত্ব হিসেবে।

ইসলামে জাতি

জাতি ও জাতীয়বাদ বিষয়ে ইমাম বান্নার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দুটি দিক এ পর্যন্ত আলোচিত হলো। এর তৃতীয়টি দিক হলো– রাষ্ট্র ও জন্মভূমির পাশাপাশি তিনি 'উম্মাহ' বা জাতি শব্দটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম বান্না বলেন– **"ইসলাম হলো রাষ্ট্র ও ভূমি তথা শাসনব্যবস্থা ও জাতি।"**

ইসলাম যেমনিভাবে স্বাধীন ও স্বনির্ভর সরকারের ওপর গুরুত্ব দেয়, তেমনিভাবে তারও আগে শাসক নির্বাচনকারী বলিষ্ঠ জাতির ওপর গুরুত্ব দেয়। কেননা, তাদের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রের উত্থান হয়।

ইসলামের জন্ম হয়েছে জাযিরাতুল আরবে। আরব-সমাজ গোত্রপ্রথা ও গোত্রীয় পক্ষপাতিত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আরবদের গোত্রই ছিল প্রশাসনের ভিত্তি ও সম্পর্কের উৎস। আরবে গোত্র ছাড়া কোনো লোকের কোনো মূল্যায়নই ছিল না। সমকালীন দুনিয়ার অন্য কোথাও এমন দৃঢ় গোত্রীয় বন্ধনের অস্তিত্ব ছিল না। গোত্রই ছিল আভিজাত্য, শক্তি কিংবা ক্ষমতা প্রদর্শনের স্তম্ভ এবং গোত্রই অর্থনীতি ও রাজনীতি। গোত্রের সন্তুষ্টিতে তারা সন্তুষ্ট হতো। গোত্র বা গোত্রপ্রধানের ক্রোধই তাদের ক্রোধের কারণ ছিল। তাদের গোত্রের লোক হক বা বাতিলের যে পক্ষেই হোক না কেন, তারা তার পক্ষে অবস্থান নিত। তাদের উপলব্ধির কেন্দ্র ছিল এই কথাটির বাহ্যিক অর্থ–

> "তোমার ভাই জালিম কিংবা মজলুম যা-ই হোক না কেন– তাকে সহযোগিতা করো।"

www.bjilibrary.com

আরবের প্রত্যেকটি গোত্রই অন্য গোত্র থেকে নিজেকে উন্নত দেখতে চাইত এবং অন্য গোত্রকে নীচু দেখতে চাইত। এ কারণেই আরবদের মাঝে পরস্পর হামলা-সংঘাত বেড়েই চলছিল। জনৈক কবি বলেছিলেন–

وأحيانا علي بكر أخينا * إذا ما لم نجد إلا أخانا.

"আমাদের কোনো ভাইয়ের অগ্রযাত্রায় আমাদের ভাই ছাড়া কেউই নেই।"

অতঃপর আরবের এমন এক পরিবেশেই ইসলামের আবির্ভাব হলো। ইসলাম আরবদের চিন্তা, উপলব্ধি ও বাস্তবতায় নিয়ে এলো এক বিরাট পরিবর্তন। গোত্রীয় সীমিত গণ্ডি থেকে বের করে ইসলাম তাদের মহান এক জাতিতে অন্তর্ভুক্ত করে নিল। সকল প্রকার পক্ষপাতিত্ব বিশেষ করে গোত্রীয় পক্ষপাতিত্ব থেকে ইসলাম কঠিনভাবে সতর্ক করল আরবদের। হাদিসে এসেছে–

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ. وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ. وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ.

"যে আসাবিয়্যাহর দিকে আহ্বান করল, আসাবিয়্যাহর জন্য যুদ্ধ করল অথবা আসাবিয়্যাহর জন্য মৃত্যুবরণ করল, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[৫৮]

আরেক হাদিসে এসেছে, রাসূল সা. ইরশাদ করেন–

مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ.

"যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতলে যুদ্ধ করে, আসাবিয়্যাহর কারণে ক্রোধান্বিত হয় অথবা আসাবিয়্যাহর দিকে ডাকে বা আসাবিয়্যাহর সাহায্যের জন্য যুদ্ধ করে, অতঃপর এতে নিহত হয়, তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু।"[৫৯]

---

৫৮. ইমাম আবু দাউদ হাদিসটি *কিতাবুল আদাব*-এ যুবাইর ইবনে মুতইম রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। হাদিস নং : ৫১২১। হাদিসটিতে দুর্বলতা রয়েছে, তবে এখানে এরপর উদ্ধৃত সহিহ মুসলিমের হাদিস এই বর্ণনাকে সমর্থন করে ।

৫৯. ইমাম মুসলিম *কিতাবুল ইমারা*-তে আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। হাদিস নং : ১৮৪৮

www.bjilibrary.com

রাসূলুল্লাহ সা.-কে আসাবিয়্যাহ বা গোত্রবাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। রাসূল সা. আসাবিয়্যাহর পরিচয় সম্পর্কে বলেন–

أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ.

"আসাবিয়্যাহ হলো– তোমার সম্প্রদায়কে জুলুমের কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করা।"[৬০]

রাসূল সা. আসাবিয়্যাহকে তাঁর সমকালীন গোত্রভিত্তিক সমাজের ধরন ও প্রভাবের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। গোত্রবাদীরা নিজ দলের পক্ষেই থাকে– তারা জালিম-নিপীড়ক যা-ই হোক না কেন। গোত্রবাদীরা সর্বদা সব বিষয়ে তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়; এমনকি প্রতিপক্ষ যতই সদাচরণ বা ন্যায়বিচার করুক না কেন। আর অত্যাচার-জুলুম করলে তো বিরোধিতা আছেই। বর্তমানে ইসলামের পুনর্জাগরণের বিরোধিতাকারীদের অবস্থানও এমনই। আপনি যতই ন্যায়বোধসম্পন্ন কথাই বলুন না কেন, তারা তা শুনতে চাইবে না। অথচ ইসলামের সুবিচারের বাণী হচ্ছে– যদি ন্যায়বিচারের ফলে তোমরা নিজেরা, তোমাদের পিতামাতা বা নিকটাত্মীয়রাও ক্ষতিগ্রস্ত হও, তবুও ন্যায়বিচার করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا... ﴿١٣٥﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সাক্ষী হিসেবে ন্যায়পরায়ণতার ওপর সুদৃঢ় থাকবে, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের যদি ক্ষতি হয়, তবুও। (বিচারপ্রার্থী) ধনী হোক বা গরিব– আল্লাহই তাদের জন্য যথেষ্ট।" সূরা নিসা : ১৩৫

...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا... ﴿٨﴾

"কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না।" সূরা মায়িদা : ৮

---

৬০. ইমাম আবু দাউদ *কিতাবুল আদাব*-এ ওয়াসিলাহ ইবনুল আসকা রা.-এর সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন; হাদিস নং : ৫১১৯। আর ইমাম ইবনে মাজাহ *কিতাবুল ফিতান*-এ হাদিসটি বর্ণনা করেন; হাদিস নং : ৩৯৪৯

www.bjilibrary.com

মানবীয় দুর্বলতার কোনো এক মুহূর্তে সাহাবায়ে কিরামের মাঝে কিছু গোত্রীয় সংঘাত বাধার উপক্রম হয়েছিল। তাঁরা গোত্রের নাম ধরে ডাকল– 'হে অমুক গোত্রের লোকেরা, হে তমুক গোত্রের লোকেরা!' রাসূল সা. তাদের এই ডাক শুনে খুবই ক্রোধান্বিত হন। তিনি বললেন, 'তোমরা আমার সামনেই জাহিলি হাঁকডাক শুরু করলে!'[৬১]

আল্লাহর রাসূল সা. এ ধরনের গোত্রীয় আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দেন–

دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ.

"তোমরা এটা থেকে মুক্ত থাকবে। কেননা, এটা দুর্গন্ধময়।"[৬২]

ইসলাম একটি জাতি বিনির্মাণ করতে চেয়েছে বিশ্বাস ও আদর্শের ওপর ভিত্তি করে; মানবসৃষ্ট কোনো বিষয়ের ওপর নয়। কেননা, যেগুলোতে মানুষের বাছাই করার কোনো সুযোগ নেই; বরং তাকদিরই তা নির্ধারণ করে দেয়, তার ওপর জাতিত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভিত্তি স্থাপিত হওয়া যৌক্তিক নয়। মানুষ তার লিঙ্গ, রং, ভাষা এবং কোন ভূমিতে তার জন্ম হবে– এগুলো বাছাই করে নিতে পারে না। বরং, কোনো মতামত প্রকাশের সুযোগ ছাড়াই মানুষের জন্য এগুলো নির্ধারিত থাকে।

আর আকিদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানুষের রয়েছে যাচাই-বাছাই করে নেওয়ার স্বাধীনতা। বস্তুত মুকাল্লিদ বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে (কোনোরূপ যাচাই-বাছাই করা ছাড়া) অন্ধ অনুসারীর ঈমান কবুল হবে কিনা– এ নিয়ে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছেন। মুহাক্কিক আলিমদের মত হচ্ছে– মুকাল্লিদের ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়।

ইসলামের দাবি হচ্ছে, মুসলিমরা সত্যের দিকে ছুটবে; যায়েদ বা উমর বা কোনো ব্যক্তির দিকে ছুটবে না। সুতরাং, মুসলিম উম্মাহ রক্ত, বর্ণ, অঞ্চল ও জাতের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় না; বরং এই উম্মাহ, ঈমান ও আল্লাহর বাণীকে সবকিছুর ওপরে রাখে। এটাই হচ্ছে ইসলামের জাতি বা মুসলিমদের জাতীয়তার ভিত্তি।

---

৬১. ইমাম ইবনে কাসির তাঁর তাফসিরে ইবনে ইসহাকের সূত্রে ঘটনাটি উল্লেখ করেন।

৬২. বুখারি : ৪৯০৭

www.bjilibrary.com

আর আল্লাহর কিতাবের ঘোষণা হলো–

...هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَ فِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚ...﴿٧٨﴾

"তিনি পূর্বেই তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এ কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হন, আর তোমরা সাক্ষী হও মানবজাতির জন্য।" সূরা হজ : ৭৮

আর এটাই ইসলামের জাতি বা মুসলিম জাতি। তাদের সর্বদা সম্বোধন করা হয় يا ايها الذين امنوا (হে মুমিনগণ) সম্বোধন দ্বারা।

মুসলিম উম্মাহর মৌলিক বৈশিষ্ট্য

চারটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ অন্যান্য জাতি থেকে আলাদা।

এক. আল্লাহমুখিতা

মুসলিমরা উৎস এবং গন্তব্য উভয় বিবেচনায় আল্লাহমুখী জাতি। এ জাতির উৎপত্তি আল্লাহর ওহির মাধ্যমে। মুসলিম জাতিকে আল্লাহপ্রদত্ত শিক্ষাদীক্ষা ও বিধিবিধান দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। তাদের দ্বীন এবং তাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত পূর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا...﴿٣﴾

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।" সূরা মায়িদা : ৩

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এ জাতির উদ্ভাবক। এ প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছে–

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا...﴿١٤٣﴾

"এভাবে আমি তোমাদের মধ্যপন্থি ন্যায়পরায়ণ জাতি করেছি।" সূরা বাকারা : ১৪৩

আয়াতে جعلنكم শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটার মানে হলো– আল্লাহ তায়ালাই মুসলিম জাতির উদ্ভাবক, বাছাইকারী বা কারিগর।

www.bjilibrary.com

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ... ﴿١١٠﴾

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের বের করা হয়েছে।" সূরা আলে ইমরান : ১১০

আয়াতে ব্যবহৃত اخرجت শব্দটি বোঝাচ্ছে যে, এখানে কোনো এক সত্তা আছেন, যিনি মুসলিম জাতিকে বের করে নিয়ে এসেছেন। অর্থাৎ, এ জাতি নিজের খেয়াল-খুশি কিংবা যুগের বিবর্তনের ফলস্বরূপ আসেনি। কৃষকের রোপণ ও পরিচর্যা ছাড়া আগাছার মতো এটি জন্মায়নি; বরং মুসলিম জাতি গুরুত্বের সাথে কৃষকের পরিকল্পিত পরিচর্যার মাধ্যমে বেড়ে ওঠা বৃক্ষের অনুরূপ। আর যিনি এই উম্মাহকে বের করে নিয়ে এসেছেন এবং পরিচর্যা করেছেন কিংবা তাঁর বাণী ধারণ করার জন্য গঠন করেছেন, তিনি স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। সুতরাং, এই উম্মাহ উৎসগতভাবে রবমুখী। গন্তব্যের দিক থেকেও একইভাবে রবমুখী। কেননা, এই উম্মাহ আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের মাঝেই নিজেদের জীবন কাটায়। জমিনে আল্লাহপ্রদত্ত বিধান কায়েমের জন্য তারা প্রাণপাত করে। সুতরাং তারা আল্লাহ কাছ থেকে আগত এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।[৬৩] যেমনটি আল্লাহ তায়ালার বাণীতে বলা হয়েছে–

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

"ঘোষণা দাও– আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন-মরণ জগৎসমূহের রব আল্লাহর উদ্দেশে নিবেদিত।" সূরা আনআম : ১৬২

দুই. মধ্যপন্থা

মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো মধ্যপন্থা। মধ্যপন্থা মুসলিম উম্মাহকে বিশ্ববাসীর শিক্ষকতার আসনে আসীন করেছে। সমগ্র মানবতার ওপর বাস্তব সাক্ষী হওয়ার উপযুক্ত করে তোলে।

---

৬৩. দেখুন, আমার রচিত *আল খাসায়িসুল আম্মাহ লিল ইসলাম* (ইসলামের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ) বইয়ের 'আর রব্বানিয়্যাহ' বৈশিষ্ট্য বিষয়ক আলোচনা; মাকতাবাতু ওয়াহবা ও মুয়াসসাতুর রিসালাহ থেকে প্রকাশিত।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا...﴿١٤٣﴾

"এভাবে আমি তোমাদের মধ্যপন্থি উম্মাহ করেছি, যেন তোমরা মানবতার ওপর সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন।"
সূরা বাকারা : ১৪৩

আর এই মধ্যমপন্থা হলো সর্বক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা। বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যপন্থা। শরিয়ত পালন ও ইবাদতে মধ্যপন্থা। চরিত্র ও মুআমালাতে মধ্যপন্থা। প্রশাসন ও বিচারে মধ্যপন্থা। চিন্তা ও উপলব্ধিতে মধ্যপন্থা। আধ্যাত্মিকতা ও জাগতিকতার মাঝে মধ্যমপন্থা। উদাহরণ ও বাস্তবতায় মধ্যপন্থা। ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা।[৬৪]

এই উম্মাহ তারাই, যারা আঁকাবাঁকা, কণ্টকাকীর্ণ ও বিদঘুটে পথের মাঝে 'সরল-সঠিক' পথের উদাহরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম। বাস্তব সাক্ষ্য পেশ করতে সক্ষম আসমান-জমিনের মালিকের পথের, আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত নবি-রাসূল, সিদ্দিকিন, শুহাদা ও সালিহিনের পথের; অভিশপ্ত ও বিভ্রান্তদের পথের নয়।

তিন. দাওয়াহ

মুসলিম উম্মাহ তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি ধারণ করে, তা হলো– দাওয়াহ। এই উম্মাহ হকের দাওয়াত ও আল্লাহর কালামের ধারক। এ উম্মাহ আত্মকেন্দ্রিক নয়; বরং প্রচারক ও সর্বজনীন। মুসলিম উম্মাহ হক, কল্যাণ ও হিদায়াত নিজেদের মধ্যে কুক্ষিগত করে রাখতে চায় না: বরং তারা হক, খাইর ও হিদায়াত মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চায়। আল্লাহর ওপর ঈমানের পাশাপাশি তাদের ওপর ফরজ করা হয়েছে– মানবতার কাছে হকের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধকে। অন্য অনেক জাতির ওপর শুধু ঈমান আনা ফরজ ছিল। এই উম্মাহর ওপর অতিরিক্ত কিছু ফরজ হওয়ার কারণ হলো, অন্য জাতিগুলোর ওপর তাদের বিশেষ মর্যাদা।

---

৬৪. প্রাগুক্ত, 'আল ওয়াসাতিয়্যাহ' বৈশিষ্ট্য বিষয়ক আলোচনা।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ... ﴿١١٠﴾

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজে আদেশ করবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান রাখবে।" সূরা আলে ইমরান : ১১০

এই উম্মাহ বৈষয়িক বা সাম্প্রদায়িক বিবেচনায় আল্লাহর মানদণ্ডে শ্রেষ্ঠত্ব পায়নি। এটা সম্ভবও না। কারণ, আরব-অনারব নির্বিশেষে যে মানুষই আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে, সে-ই এ উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্ব শুধুই সত্যের মানদণ্ডে। কারণ, তারা সৎকাজের আদেশ দেয়, অসৎকাজে বাধা দেয় এবং আল্লাহর ওপর দৃঢ় ঈমান রাখে।

আল্লাহ তায়ালা আরও অনেক আয়াতে এ কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। যেমন–

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

"তোমাদের মধ্য থেকে এমন একদল মানুষ থাকা প্রয়োজন, যারা কল্যাণের দিকে মানুষকে ডাকবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারা (এ দায়িত্ব পালনকারী মানুষেরা) হবে সফলকাম।" সূরা আলে ইমরান : ১০৪

এ আয়াতের দুটি ব্যাখ্যা আছে। প্রথম ব্যাখ্যা হলো– দাওয়াতি কাজের দায়িত্ব পালন করার মতো উপযুক্ত করে তোমরা নিজেদের গঠন করবে। জাতির ওপর আদেশ-নিষেধ আরোপের যোগ্যতা অর্জন করবে। এর মাধ্যমে তোমরা নিজেদের সফলকাম করে তুলতে পারবে। তোমাদের এই দায়িত্ব পালন তোমাদেরকে সাফল্যের পথে এগিয়ে দেবে।

দ্বিতীয় ভাষ্যটি হলো– তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে এমন একটি দক্ষ ও যোগ্য দল তৈরি করো, যারা সার্বক্ষণিক দাওয়াত, আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার-এর কাজে লিপ্ত থাকবে। যেন এর মাধ্যমে তোমাদের ওপর অর্পিত ফরজে কিফায়ার দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। আর তোমরা সেই দলটিকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করো।

www.bjilibrary.com

ইসলামের বাণী একটি বৈশ্বিক দাওয়াত। এটি প্রত্যেক জাতি, বর্ণ, গোত্র এবং প্রত্যেক ভাষাভাষী তথা সকল পর্যায়ের মানুষের জন্য। যেমন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

"আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।" সূরা আম্বিয়া : ১০৭

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا ﴿١﴾

"পরম কল্যাণময় সত্তা! যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন, যেন তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন।" সূরা ফুরকান : ১

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ... ﴿١٥٨﴾

"বলুন– হে মানুষসকল! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল।" সূরা আরাফ : ১৫৮

প্রত্যেক জাতিকে ইসলামের দিকে ডাকা মুসলিম উম্মাহর ওপর ফরজ, যেন সমগ্র মানবতার সামনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়। আরেকটি ফরজ হলো– সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদান। আর দায়িত্ব পালনে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে এই উম্মাহও যেন পূর্বের জাতিগুলোর মতো অভিশপ্ত হয়ে না পড়ে– সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۭ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٧٨﴾ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ۭ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٩﴾

"বনি ইসরাইলের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল, তারা দাউদ ও মারইয়ামের ছেলে ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল– এটা এই জন্য যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করত, তা থেকে তারা একে অপরকে নিষেধ করত না। তারা যা করত, তা কতই না নিকৃষ্ট!" সূরা মায়িদা : ৭৮-৭৯

www.bjilibrary.com

চার. একতা

মুসলিম উম্মাহর চতুর্থ বৈশিষ্ট হলো– একতা। ইসলাম একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি চায়, যদিও তা বিভিন্ন গোত্র, বর্ণ ও জাতের সমন্বয়ে গঠিত। ইসলাম তাদের একই পাত্রে গলিয়ে একীভূত করে ফেলেছে। বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতা দ্রবীভূত করে নিঃশেষ করে দিয়েছে। ইসলাম তাদের যুক্ত করে দিয়েছে অভিচ্ছেদ্য একটি গণজমায়েতে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً ۖ وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾

"তোমাদের এই উম্মাহ তো একক জাতি এবং আমিই তোমাদের রব। অতএব, আমারই ইবাদত করো।" সূরা আম্বিয়া : ৯২

وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ ﴿٥٢﴾

"তোমাদের এই উম্মাহ তো একক জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক। অতএব, আমাকে ভয় করো।" সূরা মুমিনুন : ৫২

আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের আকিদা ও শরিয়ত এক করে দিয়েছেন। মুসলিমদের লক্ষ্য অভিন্ন করে দিয়েছেন এবং তাদের জীবন চলার পথ এক করেছেন। অতএব, মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ না হয়ে কীভাবে থাকতে পারে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন–

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ...﴿١٥٣﴾

"এটাই আমার সরল পথ। তোমরা এ পথেরই অনুসরণ করবে; ভিন্ন ভিন্ন পথের অনুসারী হবে না। ভিন্ন পথের পথিক হলে, তা তোমাদের আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।" সূরা আনআম : ১৫৩

মুসলিম উম্মাহ হলো এমন জাতি– যাদের রব এক, আর তিনি হলেন আল্লাহ। তাদের নবি এক, তিনি হলেন মুহাম্মাদ সা.। তাদের ওপর নাযিলকৃত আসমানি কিতাব এক– আল কুরআন। তাদের কিবলা এক– পবিত্র কাবা বায়তুল হারাম। তাদের শরিয়তও এক, তা হলো ইসলাম। তাদের জন্মভূমিও একই– বৃহত্তর দারুল ইসলাম। তাদের নেতাও এক– খলিফা বা আমিরুল মুমিনিন,

www.bjilibrary.com

যিনি উম্মাহর রাজনৈতিক ঐক্যের বিন্যাস সাধন করেন। ইসলামে একই সময়ে দুজন খলিফা অবৈধ। কারণ, উম্মাহর বক্তব্য ও কর্মসূচি এক এবং অভিন্ন হওয়া জরুরি।

'মুসলিম জাতিসমূহ' না বলে 'মুসলিম উম্মাহ বা জাতি' বলাই সঠিক। আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী মুসলিমরা এক উম্মাহ, এক জাতি; বহু জাতি নয়। বহুজাতিত্বের ধারণা আমাদের ওপর আধিপত্যবাদীরাই চাপিয়ে দিয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার আমাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ...﴿١٠٣﴾

"তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রশিকে (দ্বীন) আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" সূরা আলে ইমরান : ১০৩

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٥﴾

"তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।" সূরা আলে ইমরান : ১০৫

কুরআনে আহলে কিতাবদের একাংশের ব্যাপারে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। তারা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ছিন্নভিন্ন করার জন্য অপচেষ্টা চালাবে। গোত্রীয় বিভেদের আগুন উসকে দেবে। আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের সতর্ক করে বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٠﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা যদি কিতাবধারীদের কোনো দলের অনুসরণ করো, তাহলে ঈমান আনার পর তারা তোমাদের কাফির বানিয়ে ছাড়বে।" সূরা আলে ইমরান : ১০০

আয়াতের শানে নুযুল এবং পরবর্তী অংশের দিকে তাকালে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আয়াতের মর্মবাণী হলো– ঐক্য প্রতিষ্ঠার পর তারা তোমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চাইবে, ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর তোমাদের পরস্পরকে শত্রু বানিয়ে ফেলার অপচেষ্টা চালাবে।

www.bjilibrary.com

উম্মাহর ঐক্যের দাবি হলো, সকল প্রকার গোত্রীয় স্বার্থের উর্ধ্বে ইসলামি ভ্রাতৃত্বকে স্থান দিতে হবে। আল্লাহ তায়ালা এই ভ্রাতৃত্বকে ঈমানের সিঁড়ি ও কাঠামো গণ্য করেছেন। তিনি বলেন–

﴿١٠﴾...إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ...

"মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই।" সূরা হুজুরাত : ১০

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন–

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ.

"মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার ওপর জুলুমও করবে না, তাকে অত্যাচারীর কাছে ছেড়েও দেবে না।"[৬৫]

অর্থাৎ, কোনো মুমিনের জন্য শোভনীয় নয় যে, সে অন্য মুমিনকে কষ্ট ও বিপদের মাঝে রেখে সরে পড়বে; বরং সেই মুমিনকে সাহায্য ও সমর্থন করাই তার কর্তব্য। এটাই ভ্রাতৃত্বের দাবি। অন্য হাদিসে এই ভ্রাতৃত্বের তাগিদ দিয়ে বলা হয়েছে–

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.

"মুসলিমদের রক্ত সমান (শাস্তির ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু, গোত্র-বর্ণের কোনো পার্থক্য নেই), একজন সাধারণ মুসলিমও কোনো ব্যক্তিকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা সকলের কর্তব্যে পরিণত হবে। আর দূরবর্তী স্থানের মুসলিমরাও তাদের পক্ষে আশ্রয় দিতে পারে।"[৬৬]

ইসলাম সর্বোচ্চ সতর্ক করে বলেছে– উম্মাহর কোনো সন্তানের সাথে শত্রুতা এমন পর্যায়ে যেতে পারবে না, যে পর্যায়ে গেলে জাহিলি যুগের গোত্রগুলোর মতো পারস্পরিক সংঘাতের সূচনা হয়।

---

৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত; মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারি : ২৪৪২, মুসলিম : ৬৭৪৩) এবং সহিহ জামিউস সগির।

৬৬. আমর ইবনে শুয়াইব রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ : ২৭৫১; ইবনে মাজাহ : ২৮৫২

www.bjilibrary.com

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

"তোমরা আমার পরে কাফির হয়ে যেয়ো না যে, তোমাদের একজন অপরজনের ঘাড়ে আঘাত করবে।"[৬৭]

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

"মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসিকি আর হত্যা করা কুফরি।"[৬৮]

উম্মাহ-চেতনা কোনো জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে লুপ্ত করে না

আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি দিকের ওপর আলাপ করা যাক– যেন কোনো সংশয়ের অবকাশ না থাকে। মুসলিম উম্মাহ ইসলামি আকিদা ও ঈমানি ভ্রাতৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই মৌলিক সুতো সকল মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির অঙ্গনে একীভূত করে। উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি জাতির স্বতন্ত্র উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ও কৃষ্টি থাকবেই– এমন কোনো কথা নেই। সমৃদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রত্যেক জাতির না-ও থাকতে পারে। তবে কোনো জাতির যদি উন্নত ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি থাকে এবং তা যদি ইসলামি ভ্রাতৃত্বের প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়, গোষ্ঠীবাদকে উসকে না দেয়, উম্মাহর ঐক্য ধ্বংসকারী কোনো ঝগড়া-বিবাদের দিকে না নিয়ে যায়, তাহলে সেই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যচর্চায় কোনো বাধা নেই।

রাসূল সা. ও তাঁর খলিফাগণ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে স্ব স্ব গোত্রের ছায়ায় জিহাদ করতে সৈনিকদের সুযোগ দিতেন। এতে তাদের উদ্দীপনা বেড়ে যায়। তাদের কর্মতৎপরতা যেন নিজ গোত্র ও স্বজনদের লজ্জার কারণ না হয়ে মর্যাদার কারণ হয়, সে ব্যাপারে তারা সজাগ থাকে। স্বগোত্র ও স্বজনদের জন্য ভালো কিছু করার ইচ্ছা, তাদেরকে যাবতীয় ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখার প্রচেষ্টা– মানবীয় স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। এতে কোনো শঠতা বা হঠকারিতা নেই। পরিবার-পরিজনদের প্রতি ভালোবাসাতে কোনো সমস্যা নেই।

---

৬৭. মুত্তাফাকুন আলাইহি, আল লুলু ওয়াল মারজান : ৪৪। জারির ইবনে আবদুল্লাহ ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর সূত্রে বর্ণিত। মুত্তাফাকুন আলাইহি; আল লুলু ওয়াল মারজান : ৪৩

www.bjilibrary.com

রাসূল সা. বংশক্রমজ্ঞান চর্চার নির্দেশ দিয়েছেন– যার মাধ্যমে রেহেমের সম্পর্ক জানা যায়; তা যত দূরেরই হোক না কেন। যেমন–

تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ.

"তোমরা তোমাদের বংশীয় ধারা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করো। এটা তোমাদের রেহেমের সম্পর্ক বজায় রাখতে সহায়তা করবে।"[৬৯]

خَيْرُكُمُ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيرَتِهِ، مَا لَمْ يَأْثَمْ.

"তোমাদের মধ্যে যারা তাদের নিরপরাধ পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করে, তারাই সর্বোত্তম।"[৭০]

সমস্যা হলো, কারও গোত্র যদি ইসলামের শত্রুতায় দাঁড়িয়ে যায় কিংবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে চ্যালেঞ্জ করে বসে! এখানেই গোত্রীয় বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও অভিভাবকত্ব গ্রহণে সংকট আছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর দ্বীনের ওপর আর কেউ প্রাধান্য পেতে পারে না, সে যতই নিকটজন হন না কেন! যেমন– ভাই, বাবা, মা, বোন, স্বামী। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ...﴿٢٢﴾

"যারা আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তাদের আপনি এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব-অভিভাবকত্ব করতে দেখবেন না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে; যদিও তারা তাদের পিতা অথবা তাদের পুত্র অথবা তাদের ভাই অথবা তাদের জাতিগোষ্ঠী হোক না কেন।" সূরা মুজাদালা : ২২

---

৬৯. তিরমিযি : ১৯৮০; *কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ*, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। ইমাম তিরমিযি বলেন, এই সনদে হাদিসটি গরিব। আহমাদ : ৩৭৪/২। ইমাম হাকিম হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। আর ইমাম হাকিমের মন্তব্যের সাথে ইমাম যাহাবি ঐকমত্য পোষণ করেছেন : ১৬১/৪।

৭০. আবু দাউদ : ৫১২০। ইমাম আবু দাউদ সুরাকা ইবনে মালিক রা.-এর সূত্রে *কিতাবুল আদাব* হাদিসটি সংকলন করেছেন। সনদে আইয়ুব ইবনে সুয়াইদ থাকার কারণে হাদিসটি জয়িফ।

www.bjilibrary.com

এ বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা দ্ব্যর্থহীন ও সুদৃঢ়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

"হে মুমিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভাই যদি ঈমানের মোকাবিলায় কুফরিকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে তাদের অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। এ নির্দেশনার পরও তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তা করে, তাহলে তারা জালিম পরিগণিত হবে। (হে নবি!) আপনি বলে দিন– তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী বা স্বামী, তোমাদের গোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যাবসা-বাণিজ্য– যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা করো এবং তোমাদের বাসস্থান– যা তোমরা ভালোবাসো, তাহলে আল্লাহর সিদ্ধান্ত আসার অপেক্ষা করো। আল্লাহ পাপিষ্ঠ গোষ্ঠীকে হিদায়াত করেন না।" সূরা তাওবা : ২৩-২৪

একজন মানুষের পক্ষে নিজ পরিবার, গোত্র ও আপনজনকে ভালোবাসায় কোনো সমস্যা নেই, এটা স্বতঃস্ফূর্ত মানবীয় ফিতরাত। কিন্তু এই ভালোবাসা যদি আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসার বিপরীতে দাঁড়ায়, তাহলে জেনে রাখতে হবে– আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসা সবকিছুর চেয়ে দামি। কবির ভাষায়–

أبي الإسلام لا أب لي سواه * إذا افتخروا بقيس أو تميم!

"ইসলামই আমার পিতা,
ইসলামের বিপরীতে আমার কোনো পিতা নেই।
আফসোস! তারা মেতে আছে
কায়েস বা তামিমকে নিয়ে।"

এ বিষয়ে একজন মুসলিমের ভাষ্য হবে সালমান ফারসি রা.-এর মতো। সালমান রা.-কে প্রশ্ন করা হলো, 'আপনি বংশপরিচয় কী?' তিনি জবাব দিলেন, 'আমি ইসলামের সন্তান।'

www.bjilibrary.com

স্বজাত্যবোধ (কওমিয়্যাত) সম্পর্কে ইমাম বান্নার দৃষ্টিভঙ্গি

কওমিয়্যাত বা স্বজাত্যবোধ বিষয়ে ইমাম হাসান আল বান্নার ছিল সুস্পষ্ট সমঝ। এ কারণে তিনি 'কওমিয়্যাত' বা 'স্বজাত্যবোধ' পরিভাষাকে পুরোপুরে নাকচ করে দেননি, আবার শর্তহীনভাবে গ্রহণও করেননি। ইমাম হাসান আল বান্না জাতীয়তাবাদের মতো এখানেও কিছু গ্রহণ এবং কিছু বর্জনের নীতি অবলম্বন করেছেন।

ইমাম হাসান আল বান্না বলেন–

"কওমিয়্যাত নিয়ে যারা উৎসাহ দেখায়, তাদের উদ্দেশ্য যদি হয়– তাদের পরবর্তী প্রজন্ম পূর্বপুরুষদের মহত্ত্ব, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কর্মস্পৃহার মতো গুণাবলির চর্চা করবে; পূর্বপুরুষদের উন্নত আচরণ তাদের আদর্শ হবে; বাবার মহত্ত্বে সন্তান গর্বিত হবে; বংশীয় ও রক্তসম্পর্কীয় অনুভূতি তাকে মহত্ত্বের গুণে গুণান্বিত হতে উৎসাহ জোগাবে; তাকে দানশীল করে তুলবে– তাহলে কওমিয়্যাতের এ দিকটি তো খুবই চমৎকার! আমরা এই কওমিয়্যাতকে সমর্থন করি এবং উৎসাহ দিই। আর এ দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা স্বজাত্যবোধকে গ্রহণ করি। আমরা তো বর্তমান প্রজন্মের হিম্মত জাগাতে আমাদের পূর্বসুরি মনীষীদের ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলি তাদের মাঝে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করি। রাসূল সা.-এর এই বাণীটি সম্ভবত সেদিকেই ইশারা করছে; রাসূল সা. বলেন–

النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا.

'মানুষ হচ্ছে সোনা-রুপার খনির মতো খনিবিশেষ। তাদের মধ্যে যারা জাহিলিয়াতে উত্তম, ইসলামেও তারা উত্তম– যখন তারা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পারে।'[৭১]

অতএব, আমরা দেখতে পাচ্ছি– ইসলাম এই ইতিবাচক ও প্রশংসিত অর্থে কওমিয়্যাত বা স্বজাত্যবোধকে নাকচ করে না।

স্বজাত্যবোধের মানে যদি হয়– সদাচারের ক্ষেত্রে স্বীয় জাতি ও স্বজনরা অগ্রাধিকার পাবে; আত্মীয়-পরিজনরা ইহসান ও প্রচেষ্টার ফল লাভের অধিক হকদার হবে– তাহলে এই দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক আছে। সাধারণত প্রত্যেকেই চায় যে,

---

৭১. মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারি : ৩৩৮৩, মুসলিম : ২৬৩৮), রাবি : আবু হুরায়রা রা., সহিহ জামিউস সগির।

www.bjilibrary.com

তার কর্মপ্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম তার আত্মীয়-স্বজন ও গোত্রের লোকজন উপকৃত হোক। কারণ, সে তাদের মাঝেই বড়ো হয়েছে, তাদের স্নেহের ছায়ায় বিকশিত হয়েছে এবং তাদের অনুগ্রহে সব সময় সিক্ত হয়েছে।

স্বজাত্যবোধ দ্বারা উদ্দেশ্য যদি হয়– যখন কোনো জাতি জিহাদের ময়দান বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে একসাথে পরীক্ষার সম্মুখীন, তখন প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ বলয়ে লক্ষ্য হাসিলের জন্য কাজ করবে অথবা এক গোত্রের সবাই একই ফ্রন্টে যুদ্ধ করবে, যাতে বিজয়ের অঙ্গনে একসাথে মিলিত হতে পারে কিংবা বিপর্যয় ঘটলে পরস্পরকে সহায়তা করতে পারে। তাহলে এ বিভাজন কতই না সুন্দর!

আমাদের জাতিগুলোর প্রত্যেকেই নিজ নিজ ময়দানে দৃঢ় ভূমিকা রাখবে, যেন সবাই মিলে একসাথে মুক্তির রাজপথে মিলিত হতে পারি।

পক্ষান্তরে স্বজাত্যবোধ দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় জাহিলি রীতিনীতির পুনরুজ্জীবন, মুছে যাওয়া ভ্রান্ত অতীতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, চলমান কল্যাণকামী সভ্যতার বিনাশ, গোত্রীয় ও বর্ণবাদী আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামের বন্ধন থেকে মুক্তি, তাহলে স্বজাত্যবোধ জঘন্য অপরাধ ও খারাপ পরিণামবাহী।[৭২] প্রাচ্যকে এটা বিপর্যয়ের কিনারায় পৌঁছে দিয়েছে। এমন জঘন্য স্বজাত্যবোধের চর্চার কারণে প্রাচ্য তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ, অবস্থান, মর্যাদা ও আভিজাত্য হারিয়ে ফেলছে। তাদের এই অপতৎপরতা আল্লাহর দ্বীনের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না; বরং তাদের নিজেদেরই ক্ষতি করছে এবং করবে। কুরআন মাজিদের ঘোষণা–

...وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴿٣٨﴾

'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের বদলে অন্য কওমকে সামনে নিয়ে আসবেন। আর তারা তোমাদের মতো হবে না।' সূরা মুহাম্মাদ : ৩৮

---

৭২. উসমানি খিলাফতের পতনকালে কিছু দেশ বিশেষ করে মুসতফা কামালের তুরস্ক এ কাজগুলো বাড়াবাড়ি আকারে করছিল; তাদের উদ্দেশ্য ছিল– আরব আর ইসলামের সৌন্দর্য ও নিদর্শন মিটিয়ে দেওয়া। তারা ইসলামি নাম, আরবি অক্ষরের ব্যবহার এবং তাদের ভাষায় ব্যবহৃত আরবি শব্দ নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেছিল, তারা মুছে যাওয়া জাহিলি রীতিনীতি পুনরুজ্জীবিত করেছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় আরব জাতীয়তাবাদের বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ে। আরব জাতীয়তাবাদীরাও ইসলাম-পূর্ব আরব ও ফারাও সংস্কৃতি নিয়ে নিকৃষ্ট গর্বে মত্ত হয়ে পড়ে। এই উভয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মুসলিম উম্মাহকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলে– ভূখণ্ডের দিক থেকে তো বটেই, হৃদয়ের বন্ধনের দিক থেকেও।

www.bjilibrary.com

অথবা স্বজাত্যবোধ যদি বর্ণবাদী গর্ব-অহংকারকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায়, যার দ্বারা অন্যান্য জাতির অধিকার খর্ব হয়, তাদের ওপর নিপীড়ন চালানো হয়, নিজেদের সম্মান ও স্থায়িত্বের জন্য অন্যদের কুরবান করা হয়, তাহলে তা খুবই নিন্দনীয় ব্যাপার। ঠিক এই কাজটিই জার্মানি বা ইতালি প্রভৃতি দেশ করেছে। তাদের প্রত্যেকেই দাবি করে– তারাই সবচেয়ে উঁচু জাতি। অন্যান্য জাতির সাথে আচরণের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে মনুষ্যত্বের কোনো ছোঁয়া নেই। এই স্বজাত্যবোধ মানবজাতিকে কিছু মরীচিকাময় ইস্যুতে খুনোখুনিতে লাগিয়ে দেয়, অথচ তার বাস্তব কোনো অস্তিত্বই হয়তো নেই।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন এরূপ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও বেইনসাফি উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত কোনো অর্থে স্বজাত্যবোধকে সমর্থন করে না। ইখওয়ান মানবসমাজে প্রচলিত ফেরাউনি, আরবীয়, ফাইকিনি, সুরিয়ানি ইত্যাদি গৌরববোধক বা তুচ্ছার্থক শব্দগুলো ব্যবহার করে না। ইখওয়ান নবিজির সেই বাণীর আলোকে মানুষকে মূল্যায়ন করে, যেখানে রাসূল সা. বলেছেন– ইনসানে কামিল (পরিপূর্ণ বা প্রত্যাশিত ব্যক্তি) হলো সে-ই, যে মানুষকে কল্যাণকর কিছু শিক্ষা দেয়। আল্লাহর রাসূল সা. বলেন–

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ.

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জাহিলি যুগের মিথ্যা গর্ব ও পূর্বপুরুষদের নিয়ে অহমিকাবোধের প্রথা বিলুপ্ত ঘোষণা করেছেন। মুমিন হলো আল্লাহভীরু আর অপরাধীরা হলো দুর্ভাগা। তোমরা সকলে আদমের বংশধর আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট। বিশেষ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া নিয়ে অহংকার করা উচিত নয়।'[৭৩]

কী অপূর্ব, চমৎকার, মনোমুগ্ধকর ও ভারসাম্যপূর্ণ কথা! সকল মানুষ আদম সন্তান। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা সকলেই সমান। কর্মই মানুষের মর্যাদার তারতম্য নির্ধারণ করতে পারে। তাই ইসলাম মানুষকে নির্দেশ দিয়েছে সৎকাজের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে; বংশমর্যাদার প্রতিযোগিতায় নয়।

---

৭৩. আবু দাউদ, কিতাবুল আদব : ৫১১৬; তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব : ৩৯৫০। ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

www.bjilibrary.com

ইসলামের দুটি বলিষ্ঠ বাণীর ওপর যদি মানবতা-মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তা আকাশসম উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। আর তা হলো– সকল মানুষ আদম সন্তান এবং তারা ভাই ভাই। সুতরাং তাদের একে অপরের সহযোগিতা ও কল্যাণে এগিয়ে আসা উচিত। পরস্পর দয়া প্রদর্শন করা উচিত। পরস্পর কল্যাণ ও উন্নত কর্মের পথনির্দেশ করা দরকার। ইনসানিয়্যাতের উন্নতির জন্য সব দিক থেকে প্রচেষ্টা চালানো দরকার। শিক্ষা ও সভ্যতা ছাড়া আর কোনোভাবে মানবতার উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে না।

আমরা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর স্বাভাবিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে নিরুৎসাহিত করি না। আমরা জানি, প্রত্যেক জাতির কিছু অনন্যতা এবং চরিত্র ও মর্যাদাগত ন্যায়নিষ্ঠা আছে। মানবীয় এই গুণ বা বৈশিষ্ট্য একেক জাতির একেক রকম হয়। এ বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা আমাদের জাতিসমূহের পরস্পরের মাঝে বৈরিতার কারণ হবে না; বরং প্রত্যেক জাতি এটাকে তাদের ওপর অর্পিত বড়ো দায়িত্ব পালনের মাধ্যম বানাবে। আরবদের কিছু বিশেষ মানবীয় গুণাবলি আছে। ইতিহাসে আরবীয় সাহাবিদের ব্যাটেলিয়ানের কাছাকাছি যোগ্যতাসম্পন্ন আর কোনো দল খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইমাম হাসান আল বান্না এই নাতিদীর্ঘ আলাপে কওমিয়্যাত বা স্বজাত্যবোধ সম্পর্কে আমাদের অবস্থান সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। তিনি আরবীয় চরিত্র ও ইসলামি চরিত্রের মাঝে বৈপরীত্য দেখাতে যাননি; কারণ, এ ধরনের বৈপরীত্য দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

*****

www.bjilibrary.com

ইমাম বান্নার দাওয়াতি আন্দোলনে জিহাদ

ইমাম হাসান আল বান্না দুটি বুনিয়াদি বিষয়কে স্পষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন; সেগুলো হলো– রাষ্ট্র ও জিহাদ। বস্তুবাদী ও ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো ইসলাম থেকে এ দুটোকে মুছে দেওয়ার অপচেষ্টা করেছে। কারণ, ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো চেয়েছে মুসলিম উম্মাহকে তাদের ইচ্ছামতো চালাতে। তারা ইসলামকে একটি নিরেট ধর্ম হিসেবে দেখতে চায়। বস্তুবাদী শক্তিগুলো বলে– 'ইসলামে কোনো রাষ্ট্রনীতি নেই।' তাদের এ কথার উদ্দেশ্য হলো– তারা যেন কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে কবজা করতে পারে।

ইতঃপূর্বে আমরা ইসলামে রাষ্ট্র ও রাজনীতির অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা জিহাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাই। সংশয়বাদী ও কাদিয়ানিদের মতো কিছু মুখোশ-উন্মোচিত গ্রুপ জিহাদ বন্ধ করার দাবি করেছে। তাদের মতে, জিহাদের সময় চলে গেছে। সাহাবিদের পর জিহাদের আর কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই। এগুলো তাদের অপরিণামদর্শী দাবি। এ কারণেই ইমাম বান্না জিহাদের ওপর জোর দিতে গিয়ে জিহাদকে তাঁর বিশ মূলনীতির প্রথম নীতিতে নিয়ে এসেছেন। ইমাম বান্না তাঁর আন্দোলনের কর্মীদের সুপ্রতিষ্ঠিত কয়েকটি শব্দ ও বাক্য দিয়ে জিহাদ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন– "নিশ্চয় ইসলাম হচ্ছে **জিহাদ ও দাওয়াত** তথা **সেনাবাহিনী ও আদর্শ**। ইসলাম যেমনি বিশুদ্ধ আকিদা (বিশ্বাস), ঠিক তেমনি বিশুদ্ধ আমলও (কাজও)। উভয়টিই সমান গুরুত্বের দাবিদার।"

প্রকৃত ব্যাপার তো হলো– ইমাম হাসান আল বান্নার প্রতিষ্ঠিত ইখওয়ানুল মুসলিমিন প্রথম দিন থেকেই জিহাদকে নিজেদের স্লোগান করে নিয়েছিল, নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের পথ করে নিয়েছিল। তাসাউফের শাইখ ও অনুসারীদের মতো কেবল আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেনি ইখওয়ান; তবে এগুলোতেও যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছে। আবার অন্যান্য অনেক সংস্কারকের মতো কেবল জ্ঞানার্জন ও জনসচেতনতা সৃষ্টিকে যথেষ্ট মনে করেনি; যদিও এতেও যথাযথ মনোযোগ দিয়েছে।

www.bjilibrary.com

প্রথম দিন থেকেই ইখওয়ানের স্লোগান হলো–

الجهاد سبيلنا.

والموت في سبيل الله أسمى أمانينا.

"জিহাদ আমাদের পথ,
আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত আমাদের পরম চাওয়া।"

ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর দাওয়াতি আন্দোলনের শুরু থেকেই স্মারক নোটসমূহে লিখতেন যে–

> "ইখওয়ানের দাওয়াত হবে একটি সামগ্রিক দাওয়াত– যার অবলম্বন হবে ইলম, তারবিয়াত ও জিহাদ। আর জিহাদের অনুশীলন ইখওয়ানের মৌলিক একটি দিক।"[৭৪]

এই দাওয়াতি আন্দোলনের প্রাথমিক যুগের সদস্যদের একটি সমুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য ছিল– 'রাতের দরবেশ এবং দিনের অশ্বারোহী' (অর্থাৎ, তারা রাতের বেলায় জায়নামাজে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হতেন, আর দিনে দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে ছিলেন কর্মতৎপর)।

ইখওয়ানের মনোগ্রাম হচ্ছে, দুটি তলোয়ারবেষ্টিত কুরআনের মাসহাফ আর তার নিচে اَعِدُّوا শব্দটি লেখা; এই শব্দ দ্বারা মূলত ইঙ্গিত করা হয়েছে কুরআনের সেই আয়াতের দিকে, যেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ... ﴿٦٠﴾

> "তোমরা তাদের (ইসলামের শত্রুদের) মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তিপ্রয়োগের প্রস্তুতি রাখো।" সূরা আনফাল : ৬০

এ আয়াতের মর্মার্থ হলো– হককে যথার্থ অবস্থানে টিকিয়ে রাখতে শক্তির সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। ইখওয়ান কর্মীরা যে কথাগুলো মুখস্থ করে, তার মধ্যে একটি হলো–

> "ইসলাম হচ্ছে রাষ্ট্র ও ধর্ম, ইবাদত ও নেতৃত্ব, সালাত ও জিহাদ, কুরআন ও শক্তি।"

---

৭৪. দেখুন, আমার বই– التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا (বাংলায় বইটির অনুবাদ 'ইমাম বান্নার পাঠশালা' নামে প্রকাশিত হয়েছে।)

www.bjilibrary.com

ইমাম হাসান আল বান্না জিহাদের ব্যাপারে সর্বদা উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। তিনি একটি মূল্যবান রিসালা লিখেছেন জিহাদের ওপর। সেই রিসালায় তিনি সকল মাযহাবের আলিমদের জিহাদ ওয়াজিব হওয়া সংক্রান্ত মতগুলো তুলে ধরেছেন। 'জিহাদ কখন ফরজে কিফায়া আর কখন ফরজে আইন' সে বিষয়েও ইমাম বান্না আলাপ তুলেছেন রিসালাটিতে। এরপর তিনি লিখেছেন–

"অতএব, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি– কীভাবে এই বিষয়ে উম্মাহর মুজতাহিদ-মুকাল্লিদ, সালাফ-খালাফ সকলেই একমত হয়েছেন! তাঁরা একমত হয়েছেন– দাওয়াত প্রসারের জন্য জিহাদ ফরজে কিফায়া এবং কাফিরদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে জিহাদ ফরজে আইন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মুসলিমরা আজ লাঞ্ছিত এবং কাফিরদের দ্বারা শাসিত। মুসলিমরা আজ নিজেদের ভূমিগুলোর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছে, তাদের সম্মান বিলীন হয়ে গেছে, তাদের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্তগুলোও নিচ্ছে শত্রুরা। এমনকি মুসলিম দেশসমূহে দ্বীনের স্লোগান অকার্যকর হয়ে গেছে। ব্যক্তিগতভাবে উম্মাহর প্রত্যেক সদস্যের এবং সামষ্টিকভাবে মুসলিম উম্মাহর প্রধান দায়িত্ব দাওয়াত সম্প্রসারণ; সেই দায়িত্ব পালনে আজ তারা অক্ষম হয়ে পড়েছে। সুতরাং, জিহাদ তো নগদে ফরজ হয়ে গেছে। এখন আর এমন অবকাশ নেই যে, সকল মুসলিম জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, সকলকে জিহাদের উদ্দেশ্যে একত্রিত করা হবে, অতঃপর একটা সময় নির্ধারণ করে সময়-সুযোগমতো আল্লাহর নামে তাঁর রাস্তায় নেমে পড়বে।

আমি এ কথাটির মাধ্যমে এই রিসালাটি সম্পূর্ণ করতে চাই– আজ মুসলিমদের আত্মমর্যাদাবোধ হয়ে গেছে নিষ্প্রাণ। এই অন্ধকার যুগের পূর্বে মুসলিম জাতি কোনো যুগেই জিহাদ পরিত্যাগ করেনি, জিহাদে কোনো শৈথিল্যও দেখায়নি, এমনকি তাদের আলিম, সুফি ও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ কেউ-ই জিহাদবিমুখ হয়নি। মুসলিমরা জিহাদের সাধারণ একটা প্রস্তুতি সব সময় রাখত। দুনিয়াবিমুখ ফকিহ আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. তাঁর সিংহভাগ সময় জিহাদের ময়দানে কাটিয়ে দিতেন। প্রখ্যাত সুফি আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যায়েদও অনুরূপ ছিলেন। তাসাউফের শাইখ শাকিক আল-বলখি নিজে তো বটেই, ছাত্রদের সাথে নিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন।

www.bjilibrary.com

বুখারি শরিফের ব্যাখ্যাকার প্রখ্যাত ফকিহ ও মুহাদ্দিস বদরুদ্দিন আইনি এক বছর জিহাদ করতেন, এক বছর ছাত্রদের পড়াতেন এবং এক বছর হজ করতেন। মালিকি মাযহাবের প্রখ্যাত আলিম কাজি আসাদ ইবনুল ফুরাত আল মালিকি ছিলেন নৌবাহিনীর প্রধান। আর ইমাম শাফিয়ি তো তিরন্দাজিতে এত তীক্ষ্ম নিশানাবাজ ছিলেন যে, দশবার তির নিক্ষেপ করলে একবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো না। এগুলো হচ্ছে আমাদের সালাফদের কথা। আর আজ ইতিহাসের গতিপথ আমাদের কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে! আমাদের মাঝে এই গুণগুলো কোথায় হারিয়ে গেল!"[৭৫]

জিহাদের অপরিহার্যতা

যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে বাতিল হকের প্রতি হুমকি, অনিষ্ট কল্যাণের ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারী, বিশৃঙ্খলাকারীরা সংস্কার-সংশোধনকারীদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো মুসলিমের ব্যক্তিগত জীবনের ইবাদত তথা সালাত, সিয়াম, সকাল-সন্ধ্যার দুআ-তাসবিহ ইসলামের পরিপূর্ণতার জন্য যথেষ্ট নয়। সম্পদের যাকাত প্রদান ও দারিদ্র্যের সমতাবিধানে ব্যয়ও তার আল্লাহর দাসত্ব ও মুসলমানিত্বের জন্য যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সামগ্রিক অর্থব্যবস্থা বাতিলের করায়ত্তে থেকে যাবে।

এটা কোনো মুসলিমের কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয় যে, সে তার বাড়িতে বসে দরজা-জানালা বন্ধ করে দেবে, আর অপকর্মের হর্তাকর্তা ও বাতিলের পরিব্রাজকদের দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টির জন্য ছেড়ে দেবে এবং তারা ইচ্ছামতো জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াবে। আগুন যেভাবে লাকড়িকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে ফেলে, সেভাবে বাতিলশক্তি হক ও নৈতিক মূল্যবোধকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দেবে, আর মুসলিম ব্যক্তি ঘরে বসে লা হাওলা, ইন্নালিল্লাহ ইত্যাদি তাসবিহ-তাহলিলে সকাল-সন্ধ্যা অতিবাহিত করবে– এটা কীভাবে হতে পারে! বরং আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের ওপর একটি ইবাদত ফরজ করেছেন। সেই ইবাদতের মাধ্যমে সে অন্যায়ের মোকাবিলা করবে, ঠিক যেমনিভাবে মহান আল্লাহ কল্যাণকর কাজে যাকাত ফরজ করেছেন। আর সে ইবাদতের নাম হচ্ছে– জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

---

৭৫. ইমাম বান্নাহর *আল জিহাদ* নামক রিসালা থেকে।

www.bjilibrary.com

মুসলিমরা জিহাদের ব্যাপারে ঠিক তেমনিভাবে আদিষ্ট, যেমনিভাবে সালাত, সিয়াম ও যাকাত ইত্যাদির ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছে। এই আদেশগুলো একেবারে সমভাবে, একইরূপে বিবৃত হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَ جَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣٥﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করো এবং তাঁর পথে জিহাদ করো– যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পারো।" সূরা মায়িদা : ৩৫

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَ اسْجُدُوْا وَ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾ وَ جَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ۭ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ ...﴿٧٨﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু করো, সিজদা করো, তোমাদের রবের ইবাদত করো ও সৎকর্ম করো, যাতে সফলকাম হতে পারো। আর সেভাবেই আল্লাহর পথে জিহাদ করো, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদের (এ দায়িত্বে) নিযুক্ত করেছেন।" সূরা হজ : ৭৭-৭৮

আল্লাহ তায়ালা জিহাদকে ঈমানের (সত্যতার ওপর) দলিল বানিয়েছেন, এমনকি যারা জিহাদ ও কুরবানির প্রস্তুতি ছাড়া ঈমানের দাবি করে, তাদের দাবিকে অস্বীকার করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ۭ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَ لٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۭ ...﴿١٤﴾

"মরুবাসীরা বলে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি'। (হে রাসূল,) আপনি বলুন– 'তোমরা ঈমান আনোনি; বরং তোমরা বলো যে, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। তোমাদের অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করেনি'।" সূরা হুজুরাত : ১৪

এরপর প্রকৃত মুসলিম কারা, তা বর্ণনা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ﴿١٥﴾

www.bjilibrary.com

"তারাই সত্যিকার মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, এরপর কোনো সংশয়ে পতিত হয়নি এবং আল্লাহর পথে তাদের জান-মাল দিয়ে জিহাদ করেছে। এরাই (ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী।" সূরা হুজুরাত : ১৫

প্রত্যেক সমাজেই কিছু দুনিয়াবিমুখ ও বৈরাগ্যপ্রিয় লোক থাকেন। সাধারণত তারা মানুষের সঙ্গ কম পছন্দ করেন; বরং নির্জনে ধর্মকর্মে নিয়োজিত থাকতেই বেশি ভালোবাসেন। ইসলাম চায়– এসকল ব্যক্তির এই আধ্যাত্মিক শক্তি, ইবাদতগুজারি ও দুনিয়াবিমুখতাকে সংকীর্ণ গুহা বা জঙ্গলে কাটানোর পরিবর্তে জিহাদের অঙ্গনে কাজে লাগাতে। কেননা, একজন গুহাবাসী দরবেশ ও একজন ময়দানের মর্দে মুজাহিদের মাঝে পার্থক্য বিশাল! একজন অন্যায় দেখে ভয়ে পালিয়ে যায়, আর অন্যজন লৌহপ্রাচীরের মতো অন্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তা প্রতিহত করে। একজন একান্ত নিজস্ব গণ্ডিতে বসবাস করে, আরেকজন স্বজাতির ভবিষ্যৎ সন্তানদের জন্য সংগ্রামী জীবনযাপন করে। রাসূল সা. তাঁর সাথিদের উপদেশ দিয়ে বলেন–

وعليكَ بالجِهادِ؛ فإنَّه رَهبانيَّةُ الإسلامِ.

"তোমাদের ওপর জিহাদ ফরজ; আর এটাই ইসলামের বৈরাগ্য।"[৭৬]

আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন–

مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشِعْبٍ فِيهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ لِطِيبِهَا فَقَالَ لَوِ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

"একবার আল্লাহর রাসূলের এক সাহাবি কোনো এক গিরিপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে গিরিপথে ছিল মিষ্টিপানির ছোটো একটি ঝরনা।

---

৭৬. মুসনাদে আহমাদ; আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত। মুনাওয়ির *আত তাইসির*-এ এসেছে, 'এ হাদিসের রাবিগণ সিকাহ'। *সহিহ জামিউস সগির*-এ হাদিসটি হাসান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

ঝরনার কলতান ও স্বচ্ছতা তাকে মুগ্ধ করে। তিনি বললেন, 'আমি মানবসমাজ ত্যাগ করে এই গিরিপথে বসবাস করতে চাই। তবে রাসূলের অনুমতি ছাড়া এ কাজ করব না।' তিনি আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে অনুমতি চান। রাসূল সা. বললেন– 'তুমি এটা করো না। কারণ, তোমাদের কারও আল্লাহর রাস্তায় অবস্থান (জিহাদ) করা, তার বাড়িতে সত্তর বছর সালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ক্ষমা করে দিন এবং জান্নাতে প্রবেশ করান? অতএব, আল্লাহর পথে জিহাদে শরিক হও। যে ব্যক্তি উষ্ট্রীর দুধ দোহনের বিরতিকাল পরিমাণ সময়ও আল্লাহর পথে জিহাদ করে, জান্নাত তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়'।"[৭৭]

ইসলামে জিহাদ ফরজ হওয়ার তাৎপর্য

একজন মুসলিম একটি সর্বজনীন বৈশ্বিক বার্তার ধারক। নিঃসঙ্গ ও অন্তর্মুখী মানসিকতার ব্যক্তির তুলনায় গণমুখী ও জিহাদি চরিত্রের মানুষই এই বার্তার যথার্থ ধারক হওয়ার অধিকতর উপযোগী। ইসলাম এমন এক বিপ্লবী আহ্বান, যার লক্ষ্যই হলো– হক ও ইনসাফের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কালিমাকে উচ্চকিত করা। ইসলামের এ বার্তা এসেছে মনের দুর্বলতা, বিবেকের পদস্খলন, দ্যোদুল্যমান চরিত্র, সামাজিক অস্থিতিশীলতা, রাষ্ট্রীয় সীমালঙ্ঘন ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর পারস্পরিক জুলুমকে দূরীভূত করতে। ইসলাম হচ্ছে সেই বার্তা, যা এসেছে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সৃষ্ট কৃত্রিম মাধ্যমগুলো নিশ্চিহ্ন করে দিতে এবং মানুষে মানুষে ভেদাভেদের দেয়াল চূর্ণ করে দিতে।

ইসলামের এই মহান দাওয়াত দুর্বলদের বলে– তোমাদের হাতগুলো শক্ত করে তোলো। অধমদের চিৎকার করে বলে– তোমাদের মাথাগুলো উঁচু করো। ঘুমন্তদের ডাক দিয়ে বলে– শিথিলতা ছেড়ে জেগে ওঠো। দাসত্বের শিকলে আবদ্ধদের ডেকে বলে– তোমাদের শৃঙ্খলগুলো ভেঙে ফেলো। আর অহংকারীদের বলে– তোমাদের অহংকারের সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসো।

---

৭৭. তিরমিযি : ১৬৫০; ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। ইমাম হাকিম এ হাদিসকে মুসলিমের শর্তে সহিহ বলেছেন এবং যাহাবি তাঁর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন; ৬৮/২; আর তাতে ৭০ বছরের পরিবর্তে ৬০ বছরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আহমাদ একই হাদিসটি আবু উমামা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

www.bjilibrary.com

ধনীদের বলে– তোমাদের সম্পদ থেকে নয়; বরং আল্লাহর সম্পদ থেকে ব্যয় করো। বংশীয় বিষয়াবলি নিয়ে গর্বকারীদের বলে– যার কর্ম তাকে পিছিয়ে দিয়েছে, তার বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারবে না। বিচারকদের বলে–

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا ۙ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ... ﴿٥٨﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন তাঁর প্রদত্ত আমানত হকদারকে বুঝিয়ে দিতে। তোমরা যখন মানুষের বিচার পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে।" সূরা নিসা : ৫৮

ইসলামের এই বার্তা আহলে কিতাবের বিবেকবানদের বলছে–

... تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ ۚ... ﴿٦٤﴾

"তোমরা এমন একটি কালিমার দিকে আসো, যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমান। তা হলো– 'আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করব না এবং আল্লাহ ছাড়া পরস্পরকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না'।" সূরা আলে ইমরান : ৬৪

সমগ্র মানবজাতিকে ইসলামের এই বার্তা ডেকে বলছে–

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقٰكُمْ ۚ... ﴿١٣﴾

"হে মানবসমাজ! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর বিভিন্ন কওম ও গোত্র বানিয়ে দিয়েছি, যাতে তোমরা একে অপরকে (ওইসব নামে) চিনতে পারো। আসলে আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে তারাই অধিক সম্মানিত, যারা অধিক মুত্তাকি।" সূরা হুজুরাত : ১৩

এমন সর্বজনীন বার্তার প্রতিপক্ষ হওয়া মূলত অন্ধত্ব। তারপরও কিছু অন্ধ প্রতিপক্ষ থাকবেই। থাকবে কিছু অহংকারী শত্রু। তারা নিজেদের স্বার্থের জন্য বিরোধিতা করবে। তারা এই বার্তার বাস্তবায়ন ও অস্তিত্বের প্রতিরোধ করতে

www.bjilibrary.com

অপচেষ্টাও চালাবে। এটা বিরল নয় যে, তারা শক্তির মাধ্যমে এই বার্তার অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে চাইবে। শক্তি ও অস্ত্র ব্যবহার করে এই মহান দাওয়াতি আন্দোলনের ফলাফল ছিনতাই করতে চাইবে। আর এই বার্তার দাঈদের শক্তি প্রদর্শন করে নিবৃত্ত, এমনকি হত্যা করে নিস্তব্ধ করে দিতে চাইবে। সর্বজনীন ও চিরন্তন এই বার্তার পক্ষে এই অন্ধত্বমূলক বিরোধিতার কারণে, দাওয়াতের কোনো দিক নিয়ে অবহেলা করা বা ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। দাওয়াতের কোনো দিককে অনিষ্টের করায়ত্তে রাখাও সম্ভব নয়। কায়সারের কর্ম কায়সারের জন্য এবং আল্লাহর কর্ম আল্লাহর জন্য ছেড়ে দেওয়াও সম্ভব নয়। এভাবে ছেড়ে দেওয়া বোকামি। ছাড় দিতে শুরু করলে একপর্যায়ে কায়সার আল্লাহর ভাগও ছিনিয়ে নেবে।

অথচ ইসলামের ঘোষণা হলো– কায়সার ও কায়সারের সবকিছুর মালিকও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ। আল্লাহর বিধান কায়সারের কাছে নত হবে না। কায়সারই আল্লাহর বিধানের কাছে নতি স্বীকার করবে। সুতরাং, এই মহান বার্তা ও তার ধারকদের অবশ্যই কথা ও কর্মের মাধ্যমে স্বেচ্ছাচারী-উদ্ধত কায়সার, কায়সারি কর্মকাণ্ড ও ইলাহ দাবিদারদের প্রত্যাঘাত করতে হবে।

অতএব, মুসলিমদের বর্তমান সময়কে নিরীক্ষণ করতে হবে। যথাসাধ্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও সাজসরঞ্জাম গ্রহণ করতে হবে। অপশক্তির মোকাবিলায় শক্তি অর্জন ও প্রয়োগ করতে হবে। দুনিয়ার বুকে প্রভুত্ব দাবিকারীদের প্রাসাদ ধ্বংস করতে শাবল-কোদাল বহন করতে হবে। সীমালঙ্ঘনকারী ও অহংকারীদের মসনদ গুড়িয়ে দিতে হবে। বিশ্বাসের স্বাধীনতার স্তম্ভকে পূর্ণ মজবুত করতে হবে।

وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٣٩﴾

"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে, যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি তারা বিরত হয়, তবে তারা যা করে আল্লাহ তো তার সম্যক দ্রষ্টা।"
সূরা আনফাল : ৩৯

যে ব্যক্তি ইসলামের অমিয় বাণীর মেজাজ বুঝতে পেরেছে, তার জন্য জিহাদ ফরজ হওয়ার কারণ এবং জিহাদ ইবাদত হওয়ার ধারণা উপলব্ধি করা কঠিন

www.bjilibrary.com

কিছু নয়। পূর্বযুগে আল্লাহ তায়ালা রাসূল ও মুসলিমদের পক্ষে উদ্ধত মিথ্যাচারীদের ওপর আসমানি ও দুনিয়াবি বিপর্যয়ের মাধ্যমে প্রতিশোধ নিতেন। তিনি আল্লাহদ্রোহীদের ওপর গজব নাযিল করতেন এবং সেই গজব তাদের ধ্বংস করে ফেলত। তারা হয়ে যেত নিস্তব্ধ ফসলের স্তূপের মতো। যেমনিভবে আল্লাহ এর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন– কওমে নুহ, আদ, সামুদ, লুত, ফিরাউন, হামান, কারুন ইত্যাদি জাতির সাথে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٠﴾

"এদের প্রত্যেককে তাদের নিজ নিজ অপরাধের কারণে আমি পাকড়াও করেছি। তাদের কারও ওপর পাঠিয়েছি নুড়ি পাথরের ঝড়, কাউকে পাকড়াও করেছে বিকট আওয়াজ, কাউকে আবার মাটিতে দাবিয়ে দিয়েছি আর কাউকে ডুবিয়ে দিয়েছি পানিতে। আল্লাহ এমন নন যে, তাদের ওপর জুলুম করবেন; বরং তারা নিজেরা নিজদের ওপর জুলুম করেছে।" সূরা আনকাবুত : ৪০

আল্লাহ তায়ালা মানবেতিহাসের শেষ উম্মাহকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দিয়ে বৈশিষ্টমণ্ডিত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা কোনো অলৌকিক বা অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ডকে এই উম্মাহর রিসালাতের প্রামাণ্যতা এবং তাঁর দাওয়াতের যথার্থতার ভিত্তি বানাননি।[৭৮] যদি আল্লাহ তায়ালা চাইতেন, তবে ইসলামের শত্রুদের অপকর্মের কারণে দুনিয়াকে ধসিয়ে দিতেন। অথবা আসমান থেকে তাদের ওপর শিলা বর্ষণ করতেন। রাসূল সা. ও মুমিনদের জিহাদে সময়দান থেকে অবসর ও নিষ্কৃতি দিতেন।

---

৭৮. আমার বক্তব্য হলো– আল্লাহপাক অলৌকিক সাহায্যকে মূল করেননি এই অর্থে যে, এটা এখানে ভিত্তি বা খুটি নয়। কিন্তু এ কথার অর্থ এ নয় যে– রাসূল সা.-এর নবুয়্যতের দাবিকে সমর্থন করতে বড়ো মুজিযা ও মহান নিদর্শন দেওয়া হয়নি অথবা কুরআনই রাসূলুল্লাহর একমাত্র মুজিযা। বরং অনেক মুজিযা ও অলৌকিক সাহায্য-সমর্থন রাসূল সা.-কে দান করা হয়েছে এবং তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। মুসলিমদের সাহায্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অলৌকিক সাহায্য প্রকাশিত হয়েছে রাসূলের যুগ থেকেই। যেমন– বদর, উহুদ, খন্দক, হুনাইন ইত্যাদি যুদ্ধে ফেরেশতাদের আগমন।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহকে সম্মানিত করেছেন। তাদের অনন্য মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। মহান আল্লাহ এই উম্মাহর ওপর নিজের নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করেছেন। তাই আল্লাহ তায়ালা এই উম্মাহর ওপর জানমাল ব্যয় করে জিহাদের দায়িত্ব দিয়েছেন। সত্যের প্রতিরক্ষার জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করে যতটুকু সরঞ্জাম ও প্রস্তুতি আছে, তা দিয়ে বাতিলের মোকাবিলা করতে হবে। এ কারণেই সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা বদরে মুশরিকদের মোকাবিলা করতে ও মুখোমুখি হতে সাময়িকভাবে অপছন্দ করেছিলেন, তাদের অবস্থানের সমালোচনা করা হয়েছে কুরআন মাজিদে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَ اِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ﴿٥﴾ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿٦﴾ وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَ تَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧﴾ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٨﴾

"এটা এরূপ, যেমন আপনার রব আপনাকে হক-সহকারে ঘর থেকে বের করেছিলেন; অথচ মুমিনদের এক দল এটা পছন্দ করেনি। সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। মনে হচ্ছিল– তারা যেন মৃত্যুর দিকে চলছে আর সে মৃত্যুকে যেন তারা স্বচক্ষে দেখতেও পাচ্ছে। স্মরণ করো, আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, দু'দলের যেকোনোটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে; আর তোমরা চাচ্ছিলে– নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক। অথচ আল্লাহ চাচ্ছিলেন, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করে কাফিরদের নির্মূল করে দেবেন। এটা এজন্য যে, তিনি সত্যকে সত্য এবং অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করেন; যদিও অপরাধীরা এটা পছন্দ করে না।" সূরা আনফাল : ৫-৮

মানুষদের জীবনটা আসলে পরীক্ষার ওপর দাঁড়িয়ে; আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٢﴾

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি সংমিশ্রিত শুক্রবিন্দু হতে। আর তাকে পরীক্ষা করার জন্য আমি তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি দিয়েছি।" সূরা ইনসান : ২

www.bjilibrary.com

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ﴿٤﴾

"অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্টের মধ্যে।" সূরা বালাদ : ৪

আর মুমিনদের পরীক্ষা তুলনামূলকভাবে একটু বেশিই কঠিন। কেননা, একজন মুমিন দাঈ ও ওহির বার্তার বাহক। তেমনি মুমিনদের জামায়াত (সব সময়) কাফির জামায়াত দ্বারা পরীক্ষার সম্মুখীন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَهَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَ قَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٥١﴾

"তখন তারা আল্লাহর ইচ্ছায় জালুতের সৈন্যদের পরাজিত করল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করলেন। আল্লাহ দাউদকে রাজত্ব ও প্রজ্ঞা দিলেন এবং মনমতো করে তাকে শিক্ষা দান করলেন। আর যদি আল্লাহ মানুষের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে অবশ্যই পৃথিবী বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হতো, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তো বিশ্বজগতের ওপর অনুগ্রহশীল।" সূরা বাকারা : ২৫১

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সৃষ্টজীবের মধ্যে একমাত্র মানুষের ওপর আল্লাহপ্রদত্ত বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে– তারা পরীক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর এই পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করেই তাদের পুরস্কার ও শাস্তি নির্ধারিত হবে। এর ওপরই ফয়সালা হবে জান্নাত-জাহান্নামের।

মহান আল্লাহ তায়ালা চাচ্ছেন, আমাদের জীবন এবং এই পৃথিবী ভালো-মন্দের সমন্বয়ে চলবে। কল্যাণ-ক্ষতির মিশ্রণ হবে। উপভোগ ও যন্ত্রণা একত্রিত হবে। দিনের পর রাত আসবে। এমনিভাবে বস্তুজগতে আলো-অন্ধকার থাকবে। অদৃশ্য জগতে ফেরেশতা ও শয়তান থাকবে। মানুষের মধ্যে ভালো ও খারাপ থাকবে। মানুষের মনে কিছু সদিচ্ছা থাকবে এবং ফেরেশতারা তাতে অনুপ্রেরণা জোগাবে। কিছু কুমন্ত্রণা থাকবে এবং শয়তান সেই কুমন্ত্রণায় প্ররোচনা ও উসকানি দেবে।

আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের পরীক্ষা করেন কাফিরদের দ্বারা। আর কাফিরদেরও পরীক্ষা করেন মুমিনদের দ্বারা। আল্লাহ দুপক্ষকেই লোকবল, সরঞ্জাম ও শক্তির জোগান দিয়ে থাকেন। তাদের একপক্ষকে অপরপক্ষের বিরুদ্ধে ফিতনা (পরীক্ষা)-স্বরূপ হাজির করেন, যেন তাদের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত হয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিতে চান, তাদের মধ্য হতে কে আল্লাহ ও রাসূল সা.-কে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে, আর কে শয়তান ও তার দলের অনুসরণ করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

"হে মানুষ! আমি তোমাদের মধ্যে একজনকে অপরজনের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা ধৈর্যধারণ করবে কি? তোমার রব সমস্ত কিছু দেখেন।" সূরা ফুরকান : ২০

...وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ...﴿٤﴾

"আল্লাহর ইচ্ছা করলে নিজেই তাদের দমন করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের একপক্ষের দ্বারা অপরপক্ষকে পরীক্ষা করতে চান।" সূরা মুহাম্মাদ : ৪

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ ۙ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾

"আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব, যাতে তোমাদের অবস্থা যাচাই করে নিতে পারি এবং দেখে নিতে পারি যে, তোমাদের মধ্যে কারা মুজাহিদ ও ধৈর্যশীল।" সূরা মুহাম্মাদ : ৩১

আসমান-জমিনের কোনো বিষয়ই আল্লাহর কাছে গোপন নয়। তারপরও মহান আল্লাহ বান্দাদের সাথে পরীক্ষকের মতো আচরণ করছেন। কারণ, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাদের কর্মের ওপর প্রতিদান দিতে চান। মানুষ কী করবে– আল্লাহ তায়ালা তা পূর্ব থেকে জানেন, কিন্তু তিনি তাঁর এই জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিদান নির্ধারণ করতে চান না। মহান আল্লাহ মানুষের কর্মের প্রমাণ পেশ করতে চান। ওজর, ব্যাখ্যা ও পক্ষ-সমর্থন এড়িয়ে যেতে চান।

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ...﴿١٤٩﴾

"বলুন– চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহরই।" সূরা আনআম : ১৪৯

একটি ভ্রান্ত সংশয়

কিছু ইসলামবিদ্বেষী শক্তি প্রচার করে– ইসলাম তরবারির মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে। মানুষকে অস্ত্রের মুখে ইসলামে প্রবেশ করানো হয়েছে। তারা ভুলে যায়, ইসলাম বৈশিষ্ট্যগতভাবে সন্তুষ্টচিত্ত ব্যতীত বা স্বাধীনতাবিহীন ঈমানকে

www.bjilibrary.com

সমর্থন করে না। মাক্কি যুগে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন–

...اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾

"আপনি কি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জোর করবেন?" সূরা ইউনুস : ৯৯

মাদানি যুগে অবতীর্ণ আয়াতে আল্লাহপাক পুনরায় বলেন–

لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ ...﴿٢٥٦﴾

"দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোরাজুরি নেই। বিভ্রান্তি হতে সুপথ স্পষ্ট হয়ে গেছে।" সূরা বাকারা : ২৫৬

ইসলামে জিহাদ হলো– অন্যায় ও বৈরিতার মোকাবিলা এবং জালিমদের অপসারণের পথ। এর ফলে মানুষ যেন নিজ ইচ্ছায় যেকোনো মত গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে এবং কোনো প্রকার ভয়ভীতি ছাড়াই নিজের চলার পথ বাছাই করে নিতে পারে।

রাসূল মুহাম্মাদ সা. সর্বশেষ ঐশীবার্তাসহ প্রেরিত হয়েছেন। তিনি মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল কিছুর দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার আহ্বান করেছেন। মূর্তিপূজা, প্রকৃতিপূজা, আসমান-জমিনে অন্য সবকিছুর পূজা থেকে মুক্তির দাওয়াত দিয়েছেন। দৃশ্যমান মানুষ বা অদৃশ্য জিন অথবা ফেরেশতার দাসত্ব এবং যেকোনো ধরনের ধারণা বা প্রবৃত্তির পূজা ছেড়ে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। রাসূল সা. এ আহ্বান করেছিলেন মুশরিকদের– যারা আল্লাহর সাথে অংশীদার বানিয়ে দৃশ্যমান বা অদৃশ্য অনেক কিছুকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে। তারা পাথরের মতো জিনিসেরও পূজা করত। এমনকি মুশরিকদের কেউ কেউ খেজুর ও মাখনকে পর্যন্ত রব হিসেবে পূজা করত। অথচ তারা ক্ষুধার্ত হলে আবার সেই মাখনই খেয়ে ফেলত!

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّ لَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَ اِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوْبُ ﴿٧٣﴾

www.bjilibrary.com

"হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে সেটা শোনো। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকো, তারা তো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এ উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্র হলেও। মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়– সেটাও তারা উদ্ধার করতে পারবে না। অন্বেষক ও অন্বেষিত উভয়ে কতই-না দুর্বল!" সূরা হজ : ৭৩

রাসূল সা. আরও আহ্বান করেছেন আহলে কিতাবদের– যারা নিজেদের কিতাবকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। এমনকি তারা নিজেদের দ্বীনকেও অপরিবর্তিত রাখেনি। আহলে কিতাবরা আল্লাহর পরিবর্তে ধর্মীয় নেতা ও পাদরিদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ কারণেই আহলে কিতাবের নেতাদের প্রতি পাঠানো চিঠিগুলো রাসূল সা. এই আয়াত দিয়ে শেষ করতেন–

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾

"বলুন– 'হে আহলে কিতাব! তোমরা আসো এমন একটি কালিমার দিকে, যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমান। তা হলো– আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করব না, তার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করব না এবং আল্লাহ ছাড়া আমাদের কেউ অপর কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করবে না।' এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দিন– 'তোমরা সাক্ষী থাকো যে আমরা আল্লাহর কাছে সমর্পিত'।" সূরা আলে ইমরান ৬৪

দুর্ভাগা মুশরিক ও আহলে কিতাবরা মুক্তির দিশারি একনিষ্ঠ এই দাওয়াতের মুখোমুখি বিরোধিতায় এসে দাঁড়িয়েছিল। অথচ রাসূল সা. হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমেই তাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাদের সাথে সর্বোত্তম পন্থায় কথা বলেছেন এবং বিতর্ক করেছেন। আল্লাহর রাসূল সা. বিতর্কের সময় এ আয়াতটি উচ্চারণ করতে কখনোই ভুলতেন না–

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ﴿٦﴾

"(এ দ্বীনের মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে কোনো কিছুর মিশ্রণ সম্ভব নয়। অতএব,) তোমাদের পথ তোমাদের জন্য, আমার পথ আমার জন্য।" সূরা কাফিরুন : ৬

www.bjilibrary.com

...لِيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ اَنْتُمْ بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٤١﴾

"আমার কর্মের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদের কর্মের দায়িত্ব তোমাদের। আমি যা করি, সে বিষয়ে তোমরা দায়মুক্ত এবং তোমরা যা করো, সে বিষয়ে আমিও দায়মুক্ত।" সূরা ইউনুস : ৪১

কিন্তু উপর্যুক্ত দুই সম্প্রদায়ই (আহলে কিতাব ও মুশরিকরা) রাসূল সা.-এর সাথে অনুরূপ সৌজন্যতা দেখাতে অস্বীকার করল। তাদের কথা ছিল– 'আমাদের জন্য আমাদের দ্বীন, কিন্তু তোমার জন্য তোমার দ্বীন নয়। আমরা আমাদের মতো কাজ করব, কিন্তু তুমি তোমার মতো করে কাজ করতে পারবে না। পাথরের উপাস্য হওয়ার অধিকার রয়েছে, কিন্তু আল্লাহকে এক বলার অধিকার নেই। মূর্তিপূজারিদের ক্ষমতা ও নেতৃত্ব লাভের অধিকার রয়েছে, তাওহিদের অনুসারীদের জন্য রয়েছে শুধু ধাওয়া ও নিপীড়ন।'

আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাথিদের ওপর বাতিল শক্তি নিদারুণ কষ্ট ও অত্যাচার চাপিয়ে দিয়েছিল। বয়কট ও ক্ষুধার্ত রাখার মতো জঘন্য কাজ করেছে। এরপর এলো হিজরতে বাধ্যকরণ এবং জন্মভূমি থেকে বিতাড়ন। মুমিনদের আল্লাহর ওপর ঈমান এবং আল্লাহর তাওহিদের দিকে আহ্বান জানানো ছাড়া আর কোনো অপরাধ ছিল না। সুতরাং, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের আত্মরক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের দাওয়াতের প্রতিরক্ষা, নিজেদের স্বাধীনতা এবং সকল প্রকার ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য প্রতিরক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন।

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰي نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُۨ ﴿٣٩﴾ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۭ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۭ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٤٠﴾

"যারা আক্রান্ত হয়েছে, তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো। কারণ, তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয় তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম। তাদের ঘরবাড়ি হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে– 'আল্লাহ আমাদের রব।'

www.bjilibrary.com

আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত আশ্রম, গির্জা, (ইহুদিদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ– যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন, যে আল্লাহকে সাহায্য করে। আল্লাহ নিশ্চয় শক্তিমান, পরাক্রমশালী।" সূরা হজ : ৩৯-৪০

আল কুরআনের অনেক আয়াত উম্মাহকে জিহাদের নির্দেশ দেয়। আদেশ দেয় মুশরিকি শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, যেমনিভাবে তারাও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

"তোমরা মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করবে, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে এবং জেনে রাখো– আল্লাহ তো মুত্তাকিদের সঙ্গে আছেন।" সূরা তাওবা : ৩৬

উল্লেখ্য, ইসলামে জিহাদ কোনো উপনিবেশবাদী উদ্দেশ্য কিংবা দুনিয়াবি গনিমতের জন্য হতে পারে না। যদি এগুলোর কোনো একটাও উদ্দেশ্য হয়, তবে তা জিহাদ বলে গণ্য হবে না। এর প্রতিদান বাতিল হবে এবং তাতে অংশগ্রহণকারীরা জাহান্নামের পথে অগ্রগামী হবে। রাসূল সা.-কে গনিমত, বংশীয় গৌরব কিংবা নিজেকে প্রদর্শনের জন্য জিহাদে লিপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তাঁর সোজাসাপটা জবাব ছিল–

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

"যে আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়, সেই ব্যক্তিই কেবল আল্লাহর রাস্তায় পরিগণিত হবে।"[৭৯]

জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ পর্যায়ের আমল। তবে জিহাদ হতে হবে কেবল আল্লাহর পথে; কোনোরূপ ভ্রষ্টতার পথে নয়। জিহাদ হবে বাতিলের সীমালঙ্ঘনের মোকাবিলায়; মানুষকে জোরপূর্বক হকের পথে আনার জন্য নয়। জিহাদ আল্লাহর ইবাদত ও মানবকল্যাণমূলক কাজের পাশাপাশি মুসলিমদের নৈমিত্তিক দায়িত্বেরই একটি অংশ।

---

৭৯. মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারি : ৬৯৫০, মুসলিম : ১৯০৪); আবু মুসা আশআরি রা.-এর সূত্রে বর্ণিত।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ ... ﴿٧٨﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু করো, সিজদা করো, তোমাদের রবের ইবাদত ও সৎকর্ম করো– যাতে সফলকাম হতে পারো। আর জিহাদ করো আল্লাহর পথে, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদের (এ দায়িত্বের জন্য) মনোনীত করেছেন।" সূরা হজ : ৭৭-৭৮

সুতরাং, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, ইমাম হাসান আল বান্না জিহাদকে কেন ইসলামের মৌলিক একটা অংশ হিসেবে এত গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন– **ইসলাম হচ্ছে জিহাদ ও দাওয়াত তথা সেনাবাহিনী ও আদর্শ;** যেমনিভাবে এটা আকিদা ও ইবাদত।

*****

www.bjilibrary.com

পরিশিষ্ট-১

'ইসলামের ব্যাপকতা' বিষয়ে দুটি পর্যবেক্ষণ

আমি এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করতে চাই।

এক. ব্যাপকতা বনাম বিভিন্ন অংশ

প্রথমত ইসলামের ব্যাপকতা আকিদা, শরিয়াহ, আখলাক, আচার-আচরণ, আইন প্রণয়ন, লেনদেন, সভ্যতা ও শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি সবকিছুকেই ধারণ করে। এ কথার অর্থ এই নয় যে, ইসলামে সকল বিষয়ের সকল কিছু বিস্তারিত বর্ণনাসহ এসেছে কিংবা, প্রত্যেকটি বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খ স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপারটা মোটেই এমন নয়। দ্বীন এবং বাস্তবতাও এটাকে সমর্থন করে না।

ইসলাম কিছু বিষয় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করেছে। যেমন : কায়িদা কুল্লিয়াহ (অনেক হুকুম ধারণকারী মৌলিক মাসয়ালা), মাকাসিদে শরিয়াহ (শরিয়াহর উদ্দেশ্যসমূহ), মৌলিক বিধিবিধান ও সর্বদা স্থির বিধানসমূহ, যেগুলোর অবস্থান স্থান-কাল-পাত্রের পরিবর্তনেও পরিবর্তন হয় না।

উপর্যুক্ত বিষয়াদি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে ইসলাম নিচের দুটি বিষয়ের যেকোনো একটি গ্রহণ করেছে।

এক. বিষয়টা মানুষের ইচ্ছা, রুচি বা মনোভাবের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ, ইসলাম নির্দিষ্ট কোনো হুকুম দেওয়া থেকে বিরত থেকেছে। এমনটা করা হয়েছে মানুষের ওপর রহমত হিসেবে এবং তাদের দুনিয়াদারিকে প্রশস্ত করার জন্য; ভুলে কিংবা অবহেলাবশত নয়। আমরা এই জায়গাগুলোর নামকরণ করছি 'মিনতাকাতুল আফউ' বা ক্ষমার অঙ্গন কিংবা সহজীকরণের অঙ্গন। এই নামকরণ আবু দারদা রা. বর্ণিত আল্লাহর রাসূলের হাদিস থেকে নেওয়া।

www.bjilibrary.com

আল্লাহর রাসূল সা. বলেন–

ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله العافية، فإن الله لم يكن نسيا، ثم تلا هذه الآية : وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا.

"'আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন, তা হালাল। আর যা হারাম করেছেন, তা হারাম। আর যে বিষয়ের ব্যাপারে চুপ থেকেছেন– তা আফউ (সহজীকরণ)। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর ক্ষমা বা সহজীকরণ গ্রহণ করো। কেননা, আল্লাহ কোনো কিছু ভুলে যান না।' অতঃপর রাসূল সা. তিলাওয়াত করেন– وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا 'আপনার রব কোনো কিছু ভুলে যান না' (সূরা মারইয়াম : ৬৪)।"[৮০]

এই জায়গাগুলোতেই ফকিহদের ইজতিহাদসমূহ বিভিন্ন রকমের হয়। ফকিহগণ নিজ নিজ ইজতিহাদের মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে শর্তপূরণ-সাপেক্ষে কিয়াসের মাধ্যমে এ অঙ্গনটা পরিপূর্ণ করার কাজ করেন। কিংবা ইসতিসলাহ, ইসতিহসান, ইসতিসহাব ইত্যাদি অমৌলিক শরয়ি দলিলের মাধ্যমে রায় দেন। এই দলিলগুলো কেউ গ্রহণ করে, আবার কেউ গ্রহণ করে না। ফলে এক্ষেত্রে ফকিহদের একাংশ শরিয়ত-পাবন্দ মানুষের জন্য পথ প্রশস্ত করে দেন। আবার আরেক দল ফকিহ, তা তুলনামূলক সংকীর্ণ করে ফেলেন।

দুই. অথবা সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা সম্বলিত একটি আয়াত বা হাদিস এসেছে। তবে উক্ত আয়াত বা হাদিস তার বিস্তারিত বিষয়াবলি তথা অমৌলিক বিষয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইস্যু এবং স্থান-কাল-পাত্রভেদে পরিবর্তনশীল বিষয়াবলিতে হস্তক্ষেপ করবে না। এ কারণে শরিয়াহর বিধিবিধানের ব্যাপারে একটি কথা বহুল প্রচলিত–

أنها تفصل فيما شأنه الثبات وتجمل فيما شأنه التغير

"অপরিবর্তশীল বিষয়গুলোতে শরিয়ত বিস্তারিত কথা বলে, বিবরণ তোলে ধরে আর পরিবর্তনশীল বিষয়গুলোতে সংক্ষিপ্তভাবে কথা বলে অর্থাৎ কেবল মূলনীতিগুলো বর্ণনা করে।"

---

৮০. বাযযার হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাইসামির মতে এ হাদিসের রাবীগণ সিকাহ : ৫৫/৭। আর হাদিসটি ইমাম হাকিম সহিহ হিসেবে বর্ণনা করেছেন : ৩৭৫/৩২; ইমাম যাহাবি তাঁর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

www.bjilibrary.com

আমরা বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকারের মতো পারিবারিক বিষয়াদির বর্ণনায় কুরআন-হাদিসে বিস্তারিত হুকুম পাই। কেননা, পারিবারিক বিষয়াবলি সর্বদা একই রকম হয়ে থাকে; এগুলো তেমন একটা পরিবর্তনশীল নয়। পাশাপাশি আমরা কিছু বিষয় দেখি, যেমন– বিচারপদ্ধতি, সরকার গঠন, শুরার ধরন ইত্যাদি। এসব ব্যাপারে ইসলামের ভাষ্য তুলনামূলক বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়নি। কেননা, এ বিষয়গুলো সভ্যতার অগ্রসরতা এবং স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তন হয়ে থাকে। আর এ বিষয়গুলোতে শরিয়ত অপরিবর্তনশীল বিধান পেশ করলে সভ্যতার গতিশীলতা বাধাগ্রস্ত হবে, সমাজের বৈচিত্র্য আটকে যাবে এবং স্বাধীনতা সীমিত হয়ে যাবে।

দুই. ব্যাপকতা মানে আমলের মর্যাদার বিভিন্নতাকে অবহেলা নয়

দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণ হচ্ছে– আকিদা, ইবাদত, আখলাক, আদাব, মুআমালাতসহ বিভিন্ন সামাজিক আচরণের সমন্বয়ে ইসলামের ব্যাপকতার ধারণা বিস্তৃত। কিন্তু এই কথার মানে এমন নয় যে, এগুলোর সবকিছুর মর্যাদা সমান। বরং দ্বীনে কোনো কিছুর অবস্থানের আলোকে সেটার মর্যাদা বিভিন্ন হয়। তেমনি প্রত্যেকটি বিষয়ের ভেতরে কিছু মূল এবং কিছু শাখা-প্রশাখা আছে। কিছুর ওপর ওই কাজের অস্তিত্ব নির্ভর করে, আবার কিছু কাজ তার পরিপূর্ণতার জন্য দরকারি। কিছু আছে ফরজ (অত্যাবশ্যকীয়), কিছু আছে নফল (অতিরিক্ত করণীয়)। কিছু আছে সন্দেহাতীত অকাট্য দলিল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, আবার কিছু আছে দ্ব্যর্থতাযুক্ত দলিলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। কিছু ব্যাপারে সবাই একমত, আবার কিছুর ব্যাপারে ইখতিলাফ বা মতপার্থক্য আছে। উসুলবিদদের সংজ্ঞাগত শ্রেণিকরণের আলোকে কিছুর মান অতীব জরুরি (ضروريات) পর্যায়ের, কিছু প্রয়োজনীয় (حاجيات) পর্যায়ের, আবার কিছুর মান শোভাবর্ধক (تحسينات) পর্যায়ের।

এ বিষয়টির অনুধাবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকটি কাজই তার অবস্থান অনুযায়ী মর্যাদাপ্রাপ্ত হবে এবং মূল্য অনুযায়ী হুকুম গ্রহণ করবে। আর বিভিন্ন আমলের মাঝে যে মর্যাদাগত ও অন্যান্য পার্থক্য আছে, আমরা তা ভুলে যাব না। কিছু মানুষ আছে– যারা শাখা-প্রশাখার সাথে মূলের আচরণ করে, সুন্নাহর সাথে ফরজের আচরণ করে, মাকরুহের সাথে হারামের আচরণ করে, ইখতিলাফি বিষয়াবলির সাথে ঐকমত্যের আচরণ করে, সন্দেহযুক্ত বিষয়াবলির সাথে অকাট্যের মতো আচরণ করে। এ কারণে তাদের সিদ্ধান্তে বৈপরীত্য ও জটিলতা তৈরি হয়ে যায় এবং অকারণেই দূরত্ব তৈরি হয়।

www.bjilibrary.com

এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাতের জন্য আমি আমার বিভিন্ন বইয়ে অনুরোধ ও সতর্ক করেছি। বিশেষ করে الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف বইয়ে আমি এটাকে فقه مراتب الأعمال বা 'কর্মের স্তরবিন্যাসের ফিকহ' শিরোনামে আলোচনা করেছি। বিগত সময়গুলোতে মুসলিমরা এ নিয়ে খুবই বাড়াবাড়ি করেছে। এমনকি তাদের কেউ কেউ একটি কাজের সাথে অন্য একটি কাজের শরয়ি সম্পর্ক সংরক্ষণের পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

এছাড়াও আমার فقه الأولويات أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة বইয়ে (অগ্রাধিকার নির্ণয়ের ফিকহ) নামে একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করেছি। আর অগ্রাধিকারের ফিকহ আরেকটি জ্ঞানকেও পূর্ণতা দেয়– তা হলো فقه الموازنات (কল্যাণ-অকল্যাণের তারতম্যের মানদণ্ড নির্ধারণের ফিকহ)। সমকালীন ইসলামি আন্দোলন এ দুটি ফিকহের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। আমি এ বইয়ে বলেছি ফিকহুল আওলাবিয়্যাতের একটা অংশ হলো– কর্ম ও শরয়ি দায়িত্বে অনুপাত নিরূপণ॥

ইসলামি শরিয়াহ যে অনুপাতে দায়িত্ব অর্পণ করে, সে অনুপাত পরিবর্তন করে দিলে দ্বীনদারিতা ও দুনিয়াবি জীবনে বড়ো ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হয়।

আকিদা-বিশ্বাসের অবস্থান আমলের পূর্বে। কারণ, আকিদা-বিশ্বাস হলো ভিত্তি (Foundation)। আমল হচ্ছে স্থাপনা (Building)। আর ভিত্তি ছাড়া কোনো স্থাপনা দাঁড়াতে পারে না।

আকিদার পরে আসে আমল (কর্ম)। আর আমল হয় বহু ধরনের, বিচিত্র রকমের। সহিহ হাদিসে এসেছে, "ঈমানের সত্তরটি শাখা রয়েছে। সবচেয়ে বড়ো হলো– لا اله الا الله বলা। আর সবচেয়ে ছোটো হলো– রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো।"[৮১] কুরআন বলছে আমাদের একেকটি কর্মের মর্যাদা আল্লাহর কাছে একেক রকম; সবগুলোর মর্যাদা সমান নয়। যেমন–

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾

৮১. মুসলিম ও আসহাবুস সুনানে আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে হাদিসটি সংকলিত হয়েছে; *জামিউস সগির*। হাদিসটির মতন হলো–

الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ أَوْ سَبْعُونَ بَابًا أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

www.bjilibrary.com

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿۲۰﴾

"হাজিদের জন্য পানি সরবরাহ এবং মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তোমরা কি তাদের পুণ্যের সমান মনে করো, যারা আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে? আল্লাহর কাছে এ উভয়টি সমতুল্য নয়। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারা আল্লাহর কাছে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, আর তারাই সফলকাম।" সূরা তাওবা : ১৯-২০

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. দুটি শরয়ি কাজের মর্যাদা পার্থক্য করে বলেছেন– জিহাদসংশ্লিষ্ট আমল হজসংশ্লিষ্ট আমল থেকে উত্তম। এ ছাড়াও হাম্বলি ও অপরাপর ফকিহগণ বলেছেন– জিহাদ হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট শারীরিক আমল।

জিহাদের মহত্ত্ব বর্ণনায় এসেছে অসংখ্য হাদিস। তার মধ্যে আবু যার গিফারি রা. থেকে বর্ণিত এই হাদিসটি খুবই প্রসিদ্ধ–

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ.

"আমি রাসূল সা.-এর কাছে আরজ করলাম– 'কোন আমল সর্বোত্তম?' রাসূল সা. জানালেন– 'আল্লাহর ওপর ঈমান আনা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা'।"[৮২]

এক সাহাবি ইবাদতে মগ্ন হওয়ার জন্য একাকিত্ব বেছে নিতে চাইলেন। আল্লাহর রাসূল সা. তাকে বললেন–

لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا

"তুমি এমনটি করো না। কেননা, তোমাদের কারও আল্লাহর রাস্তায় অবস্থান, তার ঘরে সত্তর বছর সালাত আদায় থেকে উত্তম।"[৮৩]

---

৮২. আবু যর রা. থেকে মুত্তাফাকুন আলাইহি। (বুখারি : ২৫১৮, মুসলিম : ৮৪)

৮৩. ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকিম বলেন, 'হাদিসটি মুসলিমের শর্তে সহিহ।' (তিরমিযি : ১৬৫৬; রাবি : আবু হুরায়রা রা.)।

www.bjilibrary.com

সীমান্ত প্রহরার ব্যাপারে সালমান ফারসি রা. থেকে মারফু হাদিসে এসেছে–

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ .

"এক দিন এক রাতের প্রহরা এক মাস রোজা এবং তাহাজ্জুদ থেকে উত্তম। সে যদি এ অবস্থায় মারা যায়, তার আমলনামা এ অবস্থার ওপর চলমান থাকবে। তার রিজিক তার ওপর পতিত হবে। সে ফিতনা থেকে নিরাপত্তা পাবে।"[৮৪]

ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারার আমল আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-কে মুত্তাকিদের মহান ইমাম বানিয়ে দিয়েছিল। তিনি সীমান্তবর্তী এলাকা পাহারা দিতেন। তাঁর বন্ধু ছিলেন বিশিষ্ট আবিদ ফুদাইল ইবনে ইয়ায। ফুদাইল ইবনে ইয়ায রহ. মক্কা-মদিনার হারাম শরিফে ইবাদতে মগ্নতা ও যুহদের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক তাঁর এই বন্ধুকে উদ্দেশ করে বলেন–

يَا عَابِدَ الحَرَمَيْنِ لَوْ أَبْصَرْتَنَا لَعَلِمْتَ أَنَّكَ فِي العِبَادَةِ تَلْعَبُ
مَنْ كَانَ يَخْضِبُ خَدَّهُ بِدُمُوعِهِ فَنُحُورُنَا بِدِمَائِنَا تَتَخَضَّبُ

"হে দুই হারাম শরিফের ইবাদতকারী! যদি তুমি আমাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে, তবে তোমার মনে হতো, তুমি ইবাদত নিয়ে খেলা করছ। কেউ তার মুখমণ্ডল অশ্রু দিয়ে ভিজিয়ে রাখে, আর আমরা তা ভেজাই নিজ নিজ রক্তে।"[৮৫]

ফিকহের একটি পাঠ হলো– ফরজের ওপর নফলকে প্রাধান্য দেওয়া জায়েয নয়। ফরজে আইন হবে ফরজে কিফায়ার অগ্রবর্তী। যে ফরজে কিফায়া অনাদায়ি থেকে গেছে, তা আদায়কৃত ফরজে কিফায়া থেকে অগ্রবর্তী। কোনো জামায়াতের সাথে সম্পৃক্ত ফরজে আইন কিছু লোকের সাথে সম্পৃক্ত ফরজে আইনের চেয়ে অগ্রবর্তী। সময়-নির্ধারিত ওয়াজিব সুবিধাজনক সময়ে আদায়যোগ্য ওয়াজিবের পূর্বে আদায় করতে হবে।

---

৮৪. মুসলিম : ৫০৪৭, তিরমিযি : ১৬৬৫, নাসায়ি : ৩১৬৮

৮৫. ইমাম ইবনে কাসির সূরা আলে ইমরানের শেষ আয়াতের তাফসিরে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন এবং অন্যান্য ইতিহাসবিদও এটি বর্ণনা করেছেন।

www.bjilibrary.com

একইভাবে নিজেদের ভেতরে সংস্কারধর্মী শরয়ি কাজসমূহও বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন– আবশ্যকীয় কাজসমূহ প্রয়োজনীয় বা শোভাবর্ধক কাজের পূর্বে হবে। আর প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে হবে শোভাবর্ধক কাজের পূর্বে। কিছু লোকের কল্যাণ আর গোটা উম্মাহর কল্যাণ যদি বিপরীতমুখী হয়, তাহলে উম্মাহর কল্যাণ প্রাধান্য পাবে। এখানে ফিকহুল মুয়াযানাতও ফিকহুল আওলাবিয়্যাতের সাথে যুক্ত হবে।

ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলনগুলোর অন্যতম দুর্বলতা হলো– 'অগ্রাধিকারের ফিকহ' চর্চার অনুপস্থিতি। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ইসলামি আন্দোলনগুলো মৌলিক কর্মক্ষেত্রের চেয়ে শাখা-প্রশাখায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। বড়ো বড়ো বিষয়াদির ওপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। ঐকমত্যের বিষয়ের চেয়ে মতবিরোধপূর্ণ বিষয় বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। হুসাইনের রক্তে পৃথিবী যখন লাল, তখন মশার রক্ত নিয়ে ফতোয়া চাওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে নফল কাজ নিয়ে দেখা যায় যুদ্ধংদেহি অবস্থা, অথচ ফরজের কোনো খবর নেই।

এটাই সাধারণ মুসলিমদের সার্বিক অবস্থা। প্রতি বছর মিলিয়ন মিলিয়ন মুসলিম নফল উমরা পালন করছে। অনেকে দশম বা বিংশতম হজও পালন করছে। তারা এই নফল কাজে যত খরচ করছে, তা জমা করা হলে হাজার হাজার মিলিয়ন ডলার হবে। অথচ আমরা অনেক বছর ধরেই একটি 'ইসলামি কল্যাণ ফাউন্ডেশন' (الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية)-এর জন্য এক হাজার মিলিয়ন ডলার সংগ্রহের কাজে হাঁপিয়ে উঠেছি। আমরা তার এক-দশমাংশও সংগ্রহ করতে পারিনি; এমনকি বিশভাগের একভাগ কিংবা ত্রিশভাগের একভাগও সংগ্রহ করতে পারিনি।

এই সকল নফল উমরা পালনকারীকে যখন বলা হয়, এশিয়া-আফ্রিকার এই নিপীড়িত এলাকাগুলোতে ইহুদি-নাসারাদের মোকাবিলায় আপনাদের নফল সফরের খরচগুলো দান করুন কিংবা বলা হয়– আপনারা এসকল ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য দান করুন, তখন তারা কোনো সাড়া দেয় না। এটি একটি পুরোনো রোগ। অতীতের মনস্তাত্ত্বিক গবেষকগণও এ বিষয়ে কথা বলেছেন।[৮৬]

অগ্রাধিকারের ফিকহ হলো, কোন সমস্যাটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের দাবি রাখে– তা জানা।

---

৮৬. দেখুন, বিশর আল হাফির কিসসা, *আল ইহইয়া* : ৪০৯/৩

www.bjilibrary.com

ইমাম গাযালি তাঁর *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*-এ অধিক ইবাদতকারী ফিরকা এবং সুফিদের সমালোচনা করেছেন। তাঁর কথার মর্ম হলো– তারা কিছু ইবাদত বেশি করে এবং সেই ইবাদত নিয়ে অহংকারে লিপ্ত হয়। তারা আমল বা আনুগত্যের মর্যাদার দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। একটার সাথে অন্যটার তুলনামূলক পর্যালোচনা করে না। কোনটা ফরজ, কোনটা নফল, কোনটা ফরজে আইন, কোনটা কিফায়া, কোনটা নির্ধারিত সময়ে পালনীয় ফরজ, কোনটার সময় বিস্তৃত, কোনটা বিশেষ ব্যক্তির ওপর ফরজ, কোনটা গোটা উম্মাহর ওপর ফরজ– এসব নিয়ে তারা ভাবে না।

ইমাম গাযালির একটি কথা এখানে উল্লেখ করার মতো–

ترك الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور.

"কল্যাণমূলক কাজে ধারাবাহিকতা বর্জন অনিষ্টতার কারণ।"[৮৭]

সুতরাং 'ইসলাম জীবনের সকল দিককে অন্তর্ভুক্ত করে' কথাটার অর্থ সেগুলোর মর্যাদাগত দিককে অবমূল্যায়ন করা নয় কিংবা শরয়ি মর্যাদার লঙ্ঘন নয়। প্রত্যেকটি বিষয়কে ঠিক সেভাবে মূল্যায়ন করতে হবে, যেভাবে ইসলামে বর্ণিত হয়েছে– এটাই সঠিক পন্থা।

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের
গভীর উপলব্ধি দান করেন।"

*****

৮৭. দেখুন, *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন* : ১/৩; আমার বই– *আল ইমাম আল গাযালি বাইনা মাদিহিহি ওয়া নাকিদিহি* (সমালোচক ও মুগ্ধদের চোখে ইমাম গাযালি), পৃষ্ঠা : ৮৭-৯০, দারুল ওয়াফা, আল মানসুরা, মিশর।

www.bjilibrary.com

পরিশিষ্ট-২

ইখওয়ানের পঞ্চম সম্মেলনে ইমাম বান্নার বক্তব্য

[ইখওয়ানুল মুসলিমিনের পঞ্চম সম্মেলনে ইমাম হাসান আল বান্না ইসলামের ব্যাপকতা বিষয়ে ইখওয়ানের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। সেখানে তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে 'ইওয়ানুল মুসলিমিনের ইসলাম' বলে অভিহিত করেন। ইমাম বান্নার পুরো ভাষণটি এখানে তুলে ধরা হলো।]

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইসলাম

সম্মানিত নেতৃবৃন্দ!

আপনারা আমাকে কিছু সময়ের জন্য 'ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইসলাম' এই পরিভাষাটি ব্যবহার করার সুযোগ দিন। এর মাধ্যমে আমি একথা বোঝাতে চাচ্ছি না যে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর আনীত ইসলাম বাদ দিয়ে ইখওয়ানুল মুসলিমিন অন্য কোনো ইসলাম নিয়ে হাজির হয়েছে। বরং আমি বলতে চাচ্ছি– যুগে যুগে মুসলিমদের অনেকেই ইসলামকে বিভিন্ন মোড়কে, ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে ও সীমা-পরিসীমায় বিশিষ্ট করেছে। তাদের কেউ কেউ ইসলামের প্রশস্ততা, নমনীয়তা ও বিশালতাকে ক্ষতিকরভাবে ব্যবহার করেছে (হতে পারে, সেটাতে উচ্চাঙ্গের কোনো হিকমতও নিহিত ছিল)। এ ছাড়াও তারা ইসলামের ব্যাখ্যায় মতপার্থক্যে লিপ্ত হয়েছে। ফলে তাদের পরবর্তী প্রজন্মের সামনে ইসলামের বিভিন্ন রূপ হাজির হয়েছে। সে রূপগুলোর কোনো কোনোটি একেবারেই কাছাকাছি; আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি অপরটির দূরবর্তীও। অথচ তাদের প্রণীত এই ধারণাগুলোকে রাসূল সা. ও সাহাবিদের অনুসৃত ইসলাম হিসেবে হাজির করা হয়েছে।

এর ফলে কিছু মানুষ ইসলামকে প্রকাশ্য ইবাদতসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করে; তারা এর বাইরে জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে ইসলামের উপস্থিতি কল্পনা করতে পারে না। যখন সে ইবাদত করে কিংবা কাউকে ইবাদত করতে দেখে,

www.bjilibrary.com

তখন সে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। সে মনে করে, এ ব্যক্তি ইসলামের শ্রেষ্ঠাংশে প্রবেশ করেছে, ইসলামকে পুরোপুরি ধারণ করেছে। আর আজ সাধারণ জনতার কাছে ইসলাম মানে এটাই।

আবার কিছু মানুষের কাছে ইসলাম হলো মহৎ চরিত্র, পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতা, আকল ও রুহের জন্য কাঙ্ক্ষিত দার্শনিক খোরাক এবং বস্তুবাদী স্বেচ্ছাচারিতা ও জুলুমের মানসিকতা থেকে আকল ও রুহকে বাঁচিয়ে রাখা। তাদের অনেকেই ইসলামকে এই সকল কার্যকর প্রাণশক্তির মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। আর এই সীমাবদ্ধতার কারণে তারা অন্য কোনো দিকে দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন মনে করে না। অন্য কোনো তত্ত্ব বা চিন্তা তাদেরকে আকৃষ্টও করতে পারে না।

অনেকে আবার ইসলামকে মনে করে– উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কিছু বিশ্বাস এবং প্রথাগত প্রচলিত কিছু আমলের সমষ্টি। সেই চিরায়ত আমলে কোনো সমৃদ্ধি কিংবা প্রাণের ছোঁয়া নেই এবং তা থেকে পরিত্রাণেরও সুযোগ নেই। তাই সে ইসলাম ও তৎসংশ্লিষ্ট সব বিষয় নিয়ে বিরক্ত। এমন ধ্যানধারণা সাধারণত বিদেশি সংস্কৃতিতে প্রভাবিতদের মাঝে ভূরি ভূরি দেখা যায়। তাদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরার সুযোগটাও আপনি পাবেন না; তারা শুনতেই চাইবে না। বলতে গেলে– তারা মৌলিকভাবে ইসলামের কিছুই জানে না। অথবা বিকৃত ইসলাম চর্চাকারীদের সাথে মিশে ইসলামের একটা বিকৃত ধারণা তাদের মনে গেঁথে গেছে।

আর কিছু লোক আছে, যারা উপর্যুক্ত সকল লোকের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন চোখে ইসলামকে দেখে। সংখ্যায় অল্প হলেও ইসলামকে তারা পরিপূর্ণভাবে সুষ্ঠু একটি ধারণা থেকে উপলব্ধি করে, যা এই সকল ধারণাকে শামিল করে।

এক ইসলামের বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন এই ধারণাগুলো ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা বোঝার ক্ষেত্রে মানুষকে দ্বিধায় ফেলে দেয়। সুতরাং কিছু মানুষ ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে মনে করে, ইখওয়ান হলো একটি দিকনির্দেশক ও সত্যপ্রচারকারী সংগঠন। এ সংগঠনের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা হচ্ছে মানুষের মাঝে উপদেশমূলক কথা পৌঁছে দেওয়া। মানুষকে দুনিয়াবিমুখ করা এবং আখিরাতের স্মরণ বাড়িয়ে দেওয়া। আবার কেউ কেউ মনে করে, ইখওয়ানুল মুসলিমিন একটি ব্যতিক্রমী সুফি তরিকা। তারা মানুষকে জিকিরের পদ্ধতি, ইবাদতের সৌন্দর্য, দুনিয়াবিমুখতা ও কলুষতামুক্তি শিক্ষাদানে গুরুত্ব দেয়।

www.bjilibrary.com

আবার কেউ মনে করে, ইখওয়ান একটি ফিকহি তত্ত্বের অনুসারী দল। তার সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্য হলো– কিছু আহকাম নিয়ে বিতর্ক করা এবং অন্য গ্রুপের সাথে প্রতিযোগিতা করে মানুষকে নিজেদের সাথে সম্পৃক্ত করানো। আর যারা তাদের সাথে একমত নয়, তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ পর্যন্ত জনগণের খুব কমসংখ্যক মানুষই ইখওয়ানের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে এবং ইখওয়ানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে। যারা ইখওয়ানকে দূর থেকে পর্যবেক্ষণ বা শোনার ওপর মূল্যায়ন না করে কাছে এসে জেনেছে, তারা ইখওয়ানকে পূর্বের চিত্রিত ধারণার আলোকে পায়নি। তারা ইখওয়ানের ভেতরের খবর জেনেছে। তারা ইখওয়ানের দাওয়াতের আদ্যোপান্ত তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিকভাবে জেনেছে।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী!

এ কারণেই ইখওয়ানুল মুসলিমিনের লালিত ইসলামের তত্ত্ব ও ধারণা নিয়ে আমি সংক্ষেপে কিছু কথা বলতে চাই। এ আলোচনার ফলে আমরা যেদিকে মানুষকে ডাকি, যে কর্মসূচিতে যোগদান করে গর্ববোধ করি, যা পেয়ে মর্যাদাবান অনুভব করি, তা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। তা হলো–

এক. আমরা বিশ্বাস করি– ইসলামের বিধিবিধান ও শিক্ষা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের সকল বিষয়কে বিন্যস্ত করে। যারা মনে করে– ইসলামের শিক্ষা শুধু ইবাদত ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোকেই ধারণ করে, তাদের ধারণা ভুল। ইসলাম হচ্ছে– আকিদা ও ইবাদত, জন্মভূমি ও জাতীয়তা, দ্বীন ও রাষ্ট্র, আধ্যাত্মিকতা ও বাস্তব কর্ম, কুরআন ও শক্তি (Power)। কুরআন এই সকল বিষয়েই কথা বলেছে এবং এগুলোকে ইসলামের মৌলিক বিষয় গণ্য করেছে। ইসলাম এই সবগুলোকে যথাযথ মর্যাদা দিতে বলেছে। এদিকেই নির্দেশ করছে এই আয়াতে কারিমা–

وَ ابْتَغِ فِيمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَ لَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ اَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ...﴿٧٧﴾

"আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন, তার দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান করো এবং দুনিয়া হতে তোমার অংশ ভুলো না। যেভাবে আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও (মানুষের প্রতি) সেভাবে অনুগ্রহ করো।" সূরা কাসাস : ৭৭

www.bjilibrary.com

আকিদা ও ইবাদত সম্পর্কে কুরআনে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে–

وَ مَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

"তাদের প্রতি জোরালো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক দ্বীন।" সূরা বাইয়িনা : ৫

কুরআনে বিচার-ফয়সালা ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾

"কখনোই না, আপনার রবের শপথ! তারা মুমিন হবে না, যদি তারা নিজেদের বিবাদের বিচারভার আপনার ওপর অর্পণ না করে, আপনার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে যদি কোনো দ্বিধা থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে না নেয়।" সূরা নিসা : ৬৫

ঋণ ও ব্যাবসা সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَ لْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَ لَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَ لَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَ اسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّ امْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَ لَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَ لَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ اَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَ اَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪ وَ لَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّ لَا شَهِيْدٌ... ﴿٢٨٢﴾

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের লেনদেন করো, তখন তা লিখে রাখবে। আর তোমাদের মধ্যে একজন লেখক ন্যায়সংগতভাবে যেন তা লিখে দেয়। লেখক লিখতে

www.bjilibrary.com

অস্বীকার করবে না, যেভাবে আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং সে যেন লিখে দেয়। ঋণগ্রহীতা লেখার বিষয় বলে দেবে এবং সে তার রবকে ভয় করবে, কোনো কিছু কমতি করবে না। যদি ঋণগ্রহীতা নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায়সংগতভাবে তা বলে দেয়। আর সাক্ষীদের মধ্যে যাদের ওপর তোমাদের আস্থা আছে, এমন দুজন পুরুষ সাক্ষী রাখো। যদি দুজন পুরুষ না পাও, তবে একজন পুরুষ এবং দুজন মহিলা সাক্ষী থাকবে। আর তা এজন্য যে, তাদের একজন ভুলে গেলে অপরজন তা স্মরণ করিয়ে দেবে। আর সাক্ষীদের ডাকা হলে তারা যেন আসতে অস্বীকার না করে। বিষয়টি ছোটো হোক অথবা বড়ো হোক– নির্দিষ্ট সময়সহ লিখে রাখতে তোমরা অলসতা করো না। এটা আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য সঠিক পন্থা এবং সাক্ষ্যের জন্য মজবুত ও সংশয়ে না পড়তে সহায়ক। তবে যদি পরস্পরের মধ্যে হাতে হাতে নগদ লেনদেন হয়, তাহলে তোমরা লিখে না রাখলে কোনো গুনাহ হবে না। আর যখন তোমরা ক্রয়-বিক্রয় করবে, তখন সাক্ষী রাখবে। লেখক ও সাক্ষীর কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না।" সূরা বাকারা : ২৮২

জিহাদ, কিতাল ও গাযওয়া সম্পর্কে কুরআন বলছে–

وَ اِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَ لْيَاْخُذُوْۤا اَسْلِحَتَهُمْ ۫ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ۪ وَ لْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَ لْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَ اَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَ اَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ؕ وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَنْ تَضَعُوْۤا اَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَ خُذُوْا حِذْرَكُمْ ...﴿١٠٢﴾

"আপনি যখন মুমিনদের মাঝে অবস্থান করেন এবং তাদের সঙ্গে নামাজে দাঁড়ান, তখন তাদের একটি দল যেন আপনার সঙ্গে (নামাজে) দাঁড়ায় এবং সশস্ত্র থাকে। তাদের সিজদা (নামাজ আদায়) করা হয়ে গেলে তারা আপনাদের পেছনে অবস্থান নেবে। অপর যে দলটি নামাজ আদায় করেনি, তারা এসে আপনার সঙ্গে নামাজে যোগ দেবে এবং সতর্ক ও সশস্ত্র থাকবে। কাফিররা চায় যে, তোমরা যেন

www.bjilibrary.com

অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জামের ব্যাপারে অসতর্ক হও। আর তারা (এই অসতর্কতার সুযোগে) একযোগে তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। যদি বৃষ্টির কারণে (অস্ত্র বহন করতে) তোমাদের কষ্ট হয় কিংবা তোমরা অসুস্থ হও, তবে অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের গুনাহ হবে না (যুদ্ধের সময় উপযুক্ত কারণ ছাড়া অস্ত্র হাতছাড়া করা যাবে না)। তারপরও সতর্কতা অবলম্বন করবে।" সূরা নিসা : ১০২

এগুলো ছাড়াও এ সকল প্রসঙ্গে এবং অন্যান্য প্রসঙ্গে বহু আয়াতে কারিমা প্রত্যাশিত ভদ্রতাজ্ঞান ও সামাজিক বিষয়াবলি নিয়ে কথা বলেছে।

কুরআনে কারিমের ভাষ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং কুরআনের নির্দেশনার আলোকে ইখওয়ানুল মুসলিমিন ইসলামের এই ব্যাপকতাকে ধারণ করেছে। ইখওয়ান এই দৃঢ়তর বিশ্বাসে পৌঁছেছে যে– ইসলাম একটি সর্বব্যাপী আদর্শ। জীবনের সকল দিককে শাসন করবে ইসলাম। সবকিছু ইসলামের রঙে রঙিন হবে, সকল বিধিবিধান হবে কুরআনের ভাষ্যমতে। সকল কায়দা-কানুন ও শিক্ষাদীক্ষা তারই আলোকে চলবে। উম্মাহ ইসলামের সঠিক পথে চলার জন্য কুরআন থেকে মদদ গ্রহণ করবে। যদি এ উম্মাহ কেবল ইবাদতের ক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণ করে এবং অন্যান্য ব্যাপারে অমুসলিমদের অনুসরণ করে, তাহলে এটা অপূর্ণাঙ্গ ইসলাম। অথচ ইসলামের কিয়দংশ গ্রহণ এবং অন্যান্য অংশকে বর্জন করার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। আল্লাহ বলেন–

...أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ۭ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٥﴾

"তবে কি তোমরা এই কিতাবের কিছু অংশ মেনে নেবে এবং কিছু অংশ ছেড়ে দেবে? অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে, তাদের পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া কিছুই নেই এবং কিয়ামত দিবসে তারা কঠোর শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তোমরা যা করছ– আল্লাহ সে বিষয়ে অমনোযোগী নন।" সূরা বাকারা : ৮৫

দুই. ইখওয়ানুল মুসলিমিন বিশ্বাস করে– ইসলামি শিক্ষার মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং তার সহায়িকা হলো রাসূলের সুন্নাহ। উম্মাহ যদি এ দুটোকে একনিষ্ঠভাবে ধারণ করে, তবে কখনোই বিভ্রান্ত হবে না। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ইসলামের সাথে মিলিত হয়েছে এবং তার রঙে রঙিন হয়েছে।

www.bjilibrary.com

এগুলো যে যুগে যে জাতির সাথে সম্পৃক্ত, তাদের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। এ কারণেই উম্মাহকে নির্ভেজাল ইসলামি জ্ঞানের প্রাথমিক উৎস থেকে ইসলামি ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে। আমাদের ইসলাম বুঝতে হবে সালফে সালিহিন তথা সাহাবি ও তাবিয়িগণ যেভাবে বুঝেছেন, সেভাবে। আল্লাহ ও রাসূলের সিদ্ধান্ত চলে এলে সেখানে আমাদের থেমে যেতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোনো শৃঙ্খলে আমরা শৃঙ্খলিত হব না; কেননা, আল্লাহ তায়ালা আমাদের আর কোনোকিছুতে শৃঙ্খলিত করেননি। যুগের যে রঙ আল্লাহর নীতির বিপরীত, সে রঙে আমরা রাঙব না। আর ইসলাম হচ্ছে সমগ্র মানবতার দ্বীন।

তিন. এর পাশাপাশি ইখওয়ান আরও বিশ্বাস করে– ইসলাম একটি সর্বজনীন দ্বীন হিসেবে সকল জাতিগোষ্ঠীর সকল যুগের জীবনধারাকে সুবিন্যস্ত করে। ইসলাম এসেছে এই উম্মাহর সকল সমস্যার সমাধান করতে এবং সকল সম্ভাবনাকে বিকশিত করতে। ইসলাম দুনিয়ার সমস্যাবলির কলুষমুক্ত সমাধানে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তাই ইসলাম জীবনসম্পৃক্ত সকল সমস্যায় মৌলিক কিছু নিয়মকানুন প্রণয়ন করেছে এবং মানুষকে দিয়েছে বাস্তবায়নযোগ্য কার্যকর পথের সন্ধান– যার গণ্ডিতেই হবে তার বিচরণ।

আকল বা মানবীয় বিবেচনাবোধের চিকিৎসায় ইসলাম পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছে। কেননা, মানুষের আকল হচ্ছে প্রশাসনের উদ্ভাবন, চিন্তা-পরিকল্পনা ও প্রস্তাব উত্থাপনের মাধ্যম। মানুষকে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য ইসলাম সুস্থ আকলকে প্রতিষেধক গণ্য করে। কারণ, সুস্থ আকল মানবীয় প্রয়োজনীয়তা ও লক্ষ্য থেকে কলুষতা ধুয়ে-মুছে দেয়। আকল মানুষকে পূর্ণতা ও মর্যাদার দিকে পথ দেখায় এবং উদ্দেশ্যহীনতা, সংকীর্ণতা ও অনর্থক শত্রুতা থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসে। মানবমন যখন স্থির ও সুবিন্যস্ত হয়, তার দ্বারা সংঘটিত সকল চিন্তা ও কাজ সুন্দর ও সুষ্ঠু হয়। এজন্য প্রবাদ আছে– 'ন্যায়বিচার আইনের ধারাতে নয়; বরং বিচারকের মননে থাকে'। এমনও হয় যে, সুষ্ঠু সুবিচারপূর্ণ আইনে শুধু সুবিধাবাদী বিচারকের কারণে স্বৈরাচারী ও বেইনসাফি রায় আসে। আবার অসম্পূর্ণ বা স্বৈরাচারী কোনো আইনে শুধু ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকের কল্যাণেও অনেক সময় সুবিচার সম্পন্ন হয়– যদি বিচারক কোনো প্রবৃত্তি বা অসদুদ্দেশ্য থেকে দূরে থাকেন এবং তার হৃদয়ে বরকত, রহমত, কল্যাণ ও সদাচার থাকে। তাই কুরআন মানুষের নাফস বা মননের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলাম প্রাথমিক যুগে যে সকল নাফস (ব্যক্তিমানস) তৈরি করেছে, সেগুলো মানবীয় পূর্ণতা ও উৎকর্ষতার উদাহরণ হয়ে আছে। ইসলাম সকল যুগ ও সকল জাতির জন্য উপযুক্ত ও যথার্থ দ্বীন।

www.bjilibrary.com

ইসলাম মানুষের প্রত্যেকটি প্রয়োজন ও চাহিদাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে। ইসলাম তার মৌলিক আইন ও সাধারণ নীতির বিরোধী নয়– এমন সকল সুস্থ তত্ত্ব ও ব্যবস্থা থেকে উপকৃত হওয়া থেকে নিষেধ করে না।

সম্মানিত নেতৃবৃন্দ!

আমি বক্তৃতাকে আর বেশি দীর্ঘায়িত করতে চাই না, যদিও আলোচ্য বিষয়টি দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। তবে আপনাদের জন্য এটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট মনে করি এবং এ সংক্ষিপ্ত আলাপ ইখওয়ানের কর্মীদের মনে ইসলামি চিন্তার ব্যাপকতর ধারণার আলো ছড়াবে বলে আশা রাখি।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের তত্ত্ব সকল সংস্কারকে ধারণ করে

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের এই তত্ত্বটি মানবসমাজের প্রতিটি দিকের সংস্কারের চেতনা ধারণ করে। ইখওয়ান ছাড়াও অন্য অনেকেই সংস্কার-কার্যক্রমে হাত দিয়েছিল। ইখওয়ান তাদের সকলের সংস্কার-কার্যক্রমের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের একটি উপমা পেশ করেছে। প্রত্যেক উদ্যমী একনিষ্ঠ সংস্কারক এখানে নিরাপদ ঠিকানা খুঁজে পাবে। এখানে সকল সচেতন সংস্কারকের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো সমন্বয় করা হয়েছে। কোনো দ্বিধা ছাড়াই বলা যায় ইখওয়ানুল মুসলিমিন হচ্ছে–

১. সালাফি দাওয়াত : কেননা, ইখওয়ান ইসলামের স্বচ্ছধারা কুরআন-সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতে আহ্বান করে।

২. সুন্নি তরিকা : ইখওয়ান প্রত্যেকটি কাজে নিজেদের সঁপে দেয় পবিত্র সুন্নাহর কাছে, বিশেষ করে আকিদা, ইবাদত ও এ সংক্রান্ত বিষয়াদিতে।

৩. প্রকৃত তাসাউফ : ইখওয়ান মনে করে, কল্যাণের মানদণ্ড হলো– নাফসের পবিত্রতা, অন্তরের নির্মলতা, নিয়মিত কর্মতৎপরতা, চারিত্রিক মাধুর্য, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং সৎকর্মের মাঝে ডুবে যাওয়া।

৪. রাজনৈতিক সংগঠন : ইখওয়ান নিজ নিজ দেশে সরকারব্যবস্থার সংস্কার করতে চায়। আর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মুসলিম উম্মাহর সাথে সম্পর্কের নীতি পুনর্বিন্যাস করতে চায়। জাতিকে আত্মসম্মান, মর্যাদা এবং জাতীয়তাবোধের (ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির) প্রতি গুরুত্ব দিতে শেখায়।

৫. ক্রীড়া সংগঠন : ইখওয়ানুল মুসলিমিন নিজেদের শারীরিক গঠনের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেয়। ইখওয়ান মনে করে– শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের

www.bjilibrary.com

তুলনায় উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'তোমার ওপর তোমার শরীরের অধিকার রয়েছে।'[৮৮]

আসলে ইসলাম-অর্পিত দায়িত্বসমূহ বলিষ্ঠ শরীর ছাড়া সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করা কঠিন। সালাত, সাওম, হজ, যাকাত এগুলোর জন্য কর্মক্ষম এবং উপার্জন ও রিযিকের জন্য সংগ্রাম করার উপযোগী শরীর আবশ্যক। আর ইখওয়ানের শাখাগুলো অনেকটা পেশাদার ক্রীড়া সংগঠনগুলোর মতোই শরীরচর্চায় বিশেষ মনোযোগ দেয়।

৬. শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংগঠন : ইখওয়ান শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। কেননা, ইসলাম প্রত্যেক নারী-পুরুষের ওপর জ্ঞানার্জন ফরজ করেছে। আর ইখওয়ানের ক্লাবগুলো বাস্তবিকপক্ষে শিক্ষা-সংস্কৃতির পাঠশালা আর শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

৭. আর্থিক প্রতিষ্ঠান : কেননা, ইসলাম আর্থিক কার্যক্রম ও উপার্জনের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। নবি সা. বলেছেন, 'সর্বোত্তম সম্পদ হলো সর্বোত্তম ব্যক্তির জন্য।'[৮৯] তিনি আরও বলেন– 'যে ব্যক্তি ওজন মাপার কাজে একটি সন্ধ্যা অতিক্রান্ত করল। তার হাত তার জন্য মাগফিরাত কামনায় সময়টি কাটাল।'[৯০] 'আল্লাহ তায়ালা পেশায় যুক্ত মুমিনদের ভালোবাসেন।'[৯১]

---

৮৮. মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারি : ১৯৭৫, মুসলিম : ১১৫৯); আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। হাদিসটির মতন হলো–

فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

৮৯. ইমাম আহমাদ ও হাকিম হাদিসটি সহিহ হিসেবে বর্ণনা করেছেন আমর ইবনুল আস রা.-এর সূত্রে (আহমাদ : ১৭৯১৫, শারহুস সুন্নাহ : ২৪৯৬)। হাদিসটির মতন হলো–

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ.

৯০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে তাবারানি এ হাদিসটি 'আল আওসাত'-এ সংকলন করেছেন। এর সনদ দুর্বল; যেমনটি আল মুনাওয়ির *আত তাইসির*-এ এসেছে। হাদিসটির মতন হলো–

مَنْ أَمْسَى كَالًّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ.

৯১. হাকিম, তিরমিযি, তাবারানি ও বায়হাকি হাদিসটি সংকলন করেছেন। ইমাম বায়হাকি *শুআবুল ঈমান* গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেন। *আত-তাইসির*-এ এসেছে এটা জয়িফ। হাদিসটির মতন হলো–

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ.

www.bjilibrary.com

৮. সমাজ সংস্কারক : ইখওয়ান মুসলিম সমাজের রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। মুসলিমদের সমস্যাবলি সমাধানের পথ অন্বেষণ করে। উম্মাহকে এ সকল অসুস্থতা থেকে সুস্থ করে তুলতে চায়।

অতএব, আমাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, ব্যাপকতর ইসলামের ধারণা আমাদের চিন্তাধারাকে সকল প্রকার সংস্কারের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। ইসলামের এই প্রতিটি দিকের সাথে ইখওয়ানের কর্মতৎপরতা সংযুক্ত। একই সময়ে অন্যরা যখন ইসলামের কোনো একটি দিক নিয়ে ব্যস্ত, তখন ইখওয়ান সবগুলো দিকেই মনোযোগী হয়েছে। ইখওয়ানুল মুসলিমিন মনে করে– ইসলাম একটি সর্বব্যাপী দ্বীন; মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগকে ইসলাম পুনর্বিন্যাস করতে চায়। তাই ইখওয়ানের কর্মসূচিও সর্বব্যাপী। এ কারণে ইখওয়ানের অনেক কাজ সাধারণের চোখে একটি অপরটির বিপরীতমুখী, কিন্তু আসলে এগুলোর কোনোটিই কোনোটির বিপরীত নয়; বরং পরিপূরক।

মানুষ তাদের এক মুসলিম ভাইকে মসজিদের মিহরাবে বক্তৃতার সময় বিনয়াবনত, ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখে। কিছুক্ষণ পরেই তাকে তেজস্বী শিক্ষক ও ওয়ায়েজ হিসেবে দেখে। কিছুক্ষণ পর সেই মানুষকেই একজন দর্শনীয় খেলোয়াড় হিসেবে দেখছে, যে চমৎকার ফুটবল খেলছে, প্রতিযোগীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বা সাঁতারে প্রথম হচ্ছে। একটা সময় পর সে ব্যক্তিই তার ব্যাবসাপ্রতিষ্ঠান বা কর্মক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও আমানতদারির সঙ্গে কাজ করছে। এই দৃশ্যগুলোকে মানুষ পরস্পরবিরোধী মনে করে। তাদের ধারণা, এগুলো একটি অপরটির সঙ্গে যায় না। তারা যদি জানত, এসবকে ইসলামই একত্রিত করেছে, এ নির্দেশগুলো ইসলামই দিয়েছে, ইসলাই এগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে, তাহলে তারা সেগুলোর মাঝে সমন্বয় ও সংযোগ খুঁজে পেত।

ইখওয়ান এরূপ বিস্তৃত কর্মের পাশাপাশি এ সকল অঙ্গনে সংকীর্ণ ও বিতর্কিত বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করেছে। তেমনি তারা ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ নিয়ে কপটতা থেকে বিরত থেকেছে। কারণ, ইসলাম তাদের একত্রিত করেছে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মতো সুন্দর একটি নামের ছায়াতলে।

(পঞ্চম সম্মেলনের ভাষণটি এখানে শেষ হলো।)

*****

সমাপ্ত

www.bjilibrary.com

ড. ইউসুফ আল কারযাভী

ইউসুফ আল কারযাভী শতাব্দীর সেরা জ্ঞানসাধকদের অন্যতম। পড়াশোনা করেছেন আল আজহারের উসুলুদ দ্বীন অনুষদে। তিনি আল আজহারের সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হলো– তাকে অভিহিত করা হয় 'ইমামুল ওয়াসাতিয়্যাহ' বা মধ্যপন্থার ইমাম অভিধায়।

সমসাময়িক আলিমদের মাঝে ইউসুফ আল কারযাভীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো– তিনি জ্ঞানের প্রাচীন ভান্ডারের সাথে সময়ের চাহিদার সমন্বয় করেছেন। তিনি কোনো বিষয়ে যখন কলম ধরেন, তখন সকল মত ও দলিল বিশ্লেষণ করে নিজের মত প্রকাশ করেন। তিনি ইসলামি জ্ঞান-গবেষণায় কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করেননি।

ড. কারযাভী ইমাম হাসান আল বান্নার চিন্তাধারায় প্রভাবিত। নিজেকে তিনি ইমাম বান্নার ছাত্র হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। তিনি ইমাম হাসান আল বান্নার *উসুলুল ইশরিন* তথা বিশ মূলনীতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন।

ইউসুফ আল কারযাভী সুবক্তা ও লেখক হিসেবে প্রসিদ্ধ। তাঁর লিখিত বইয়ের সংখ্যা দুই শতাধিক। তাঁর জুমার খুতবা সংকলন আকারে এবং বিভিন্ন বক্তৃতা পুস্তিকা আকারে পাওয়া যায়। তাঁর রচিত গ্রন্থ *ইসলামে হালাল হারামের বিধান* ও *ইসলামের যাকাত বিধান* বই দুটো দুনিয়াব্যাপী সমাদৃত।

ইউসুফ আবদুল্লাহ আল কারযাভীর জন্ম ১৯২৬ সালে, মিশরে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি কাতারে বসবাস করছেন। পেশাগত জীবনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করেছেন; অধ্যাপনার সিংহভাগ কেটেছে কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমানে লেখালিখি ও জ্ঞান-গবেষণায় কাটাচ্ছেন তাঁর অবসর জীবন।

প্রচ্ছদ : হাশেম আলী, ০১৮৫৫৮৭৬৪৭০

তারিক মাহমুদ

তারিক মাহমুদের জন্ম নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায়। বাবা শিক্ষক, মা গৃহিনী। পড়াশোনা করেছেন তা'মীরুল মিল্লাত মাদরাসা এবং আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়া বিভাগে।

কর্মজীবনে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন তিনি। পাশাপাশি অনুবাদ ও সম্পাদনার সাথেও যুক্ত। অনুবাদ সাহিত্যে যাত্রা শুরু ইউসুফ আল কারযাভীর *ইসলামের ব্যাপকতা* দিয়ে। উসতায কারযাভীর *মুমিন জীবনে সময়* বইটিও তার অনুবাদ। সম্পাদিত বইয়ের সংখ্যা পাঁচ। আরও বেশ কিছু অনুবাদকর্মের প্রকাশ প্রক্রিয়াধীন।

আমাদের প্রকাশিত
ড. ইউসুফ আল্ কারযাভীর বইসমূহ

ইসলামের ব্যাপকতা
জীবনবিধান ইসলাম
কুরআনের সান্নিধ্যে
মানুষ : মর্যাদা ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য
অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে যাকাতের ভূমিকা
ইসলাম ও শিল্পকলা
ইসলামের প্রথম মুজাদ্দিদ উমর ইবনে আবদুল আজিজ
আলিম ও স্বৈরশাসক
ইমাম হাসান আল বান্না : নতুন যুগের নির্মাতা
ইমাম বান্নার পাঠশালা (ইখওয়ানের তারবিয়াত পদ্ধতি)
তাকফির : কাফির ঘোষণায় বাড়াবাড়ি ও মূলনীতি

প্রচ্ছদ প্রকাশন